খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তীর জীবনী।

মৌলভী আজহারুল আলী বখ্‌তীয়ারী প্রণীত।

প্রকাশক—

মোহাম্মদ কোরবান আলী।

সন ১৩২৯ সাল

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

Date of Print

প্রকাশক—
মোহাম্মদ কোরবান আলী,
ওসমানিয়া লাইব্রেরী,
১১নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার্স—
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স, লিমিটেড,
৪০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পীর দস্তগীর রৌশন জমীর
হাজীওল, হরমায়েন, জনাব
শাহ্, সুফি, মোহাম্মদ
আবুবকার সাহেবের
কর কমলে
ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থখানি
উৎসর্গকৃত হইল

বিনীত—
গ্রন্থকার ও প্রকাশক।

নিবেদন।

যাঁহার শুভাগমনে আসমুদ্র হিন্দুস্থান গৌরবান্বিত, যাঁহার সরল-মধুর উপদেশ শ্রবণে লক্ষ লক্ষ ভ্রমান্ধ মানব সত্যধর্ম্মের সন্ধান লাভে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার অলৌকিক কার্য্য-কলাপ দর্শনে নাস্তিকগণের হৃদয়েও আস্তিকতার আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, যাঁহার পবিত্র পাদস্পর্শ লাভ করিয়া আজমীর আজ জগতের মধ্যে অন্যতম তীর্থস্থানে পরিণত, যাঁহার পূত সমাধি দর্শনে আজও কোটী কোটী মানবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছে, যিনি 'চিশ্‌তীয়াতরিকার' প্রবর্ত্তক, সেই তাপসকুল বরেণ্য আওলিয়া গৌরবকেতু ও ইসলাম ধর্ম্মের অন্যতম স্তম্ভ হজরৎ খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী রহমতুল্লা আলায়হের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। যাঁহার প্রশংসাগীতি ইস্‌লাম জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত্ মেঘমন্দ্রে ধ্বনিত হইতেছে, যিনি পৌত্তলিকা তামসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতি সম্পাৎ করিয়াছেন, এবং যিনি বহু কেরামত প্রদর্শনে ভারতবাসীকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র জীবনী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নহে তবে আমি বহু পরিশ্রমে জনাব মৌলানা আবুল ফথর আকবরাবাদী সাহেবের রচিত "খাজা সাহেবের

"শোয়ানীয়ে' উম্‌রী" ও "তওয়ারীখ ফেরেস্তা" নামক উর্দ্দু গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য লইয়া ইহা প্রনয়ণ করিলাম এক্ষণে পুস্তকখানি সুধী সমাজে সমাদৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব

খাজা সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণকে অবগত করানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য যাহাতে বঙ্গভাষাভাষি সকলেই ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত যারপরনাই সরল ভাষার সাহায্য লওয়া হইয়াছে

পরিশেষে বক্তব্য, আমি এই পুস্তকের কপিরাইট (স্বত্ব) মাননীয় প্রকাশক সাহেবকে উচিৎ মূল্যে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম নিবেদন ইতি—

সন ১৩২৯ সাল
সাকিন খলিসানি
পোঃ, বাণীবন, হাওড়া।

বিনীত—
আজহার আলী বখ্‌তীয়ারী

আভাষ

হজরৎ খাজা মঈনদ্দীন

চিশ্‌তীর জীবনী।

ও

আউলিয়ায়ে হেন্দ ব কেরামতে আজমীরী।

প্রশংসা মাত্রেই সেই খোদাওন্দ তায়ালার উপযুক্ত। তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিয়া তিনি স্বীয় নুর হইতে জগৎমান্য হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)কে সৃজন করেন; এবং তাঁহাকে স্বীয় হাবিব সম্বোধনে তাঁহার গৌরব বর্দ্ধনার্থ নিজ নামের সহিত তাঁহার নামের সংযোজনা করিয়া, আরস আজিমে লিপিবদ্ধ করেন তৎপরে তাঁহার নুর হইতে দয়াময় আল্লাহ-তালা "সারে মোখ্‌লুকাত" সৃষ্টি করেন জগৎ-পালক খোদাতালা আপনার অনন্ত মহিমা সর্ব্বত্রে প্রচার মানসে তাঁহার প্রিয় হাবিবকে শেষনবী উপাধি প্রদানে স্বীয় মুখজাত-বাণী পবিত্র কোরাণ শাস্ত্র সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়া এ মর-জগতের মুখোজ্জ্বল করেন ইহাতে সৃজনকর্ত্তার মানস এই যে, তাঁহার পথভ্রান্ত বান্দাদিগকে হেদায়েত করান। আমাদের সেই অন্তিম কাণ্ডারী, পাপ-তাপ-হারী রসুলে করিম (সঃ) মের

উদ্দেশে শত সহস্র দরূদ পাঠ করিতেছি (আমিন্ আমিন্ ছুম্মা আমিন্)

আল্লাহতালার অনন্তলীলা, তিনি লীলাক্রমে মানবগণের আদিপুরুষ হজরৎ আদম আলাহেচ্ছালামকে বিনা পিতা-মাতায় সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে পয়গম্বরী প্রদান করেন। তিনি জগতে আসিয়া যথাবিহিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভবলীলা সংবরণ করেন তৎপরে শীশ আলায়হেচ্ছালাম পিতার প্রবর্ত্তিত কার্য্য সমাধা করিতে থাকেন এই প্রকার ইস্‌লামের খেদমতে বহু-বহু পয়গম্বর গত হইয়া যায়। আমাদের শেষ পয়গম্বর হজরত রসুল মকবুল (সঃ) গত হইবার পরে খোদাওন্দতালা মানবমণ্ডলীকে সুপথগামী করিবার জন্য জগতের স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ওলী, আব্‌দাল, আউলিয়া, গওস কুতব প্রভৃতি মহাদ্দেছ্ ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করেন। উক্ত অলী আউলিয়াদিগের মধ্যে হুজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (র) অন্যতম। পরম খোদাওন্দ তালা খাজা সাহেবকে সৈয়দ-বংশে জন্ম দিয়া হিন্দুস্থানের মধ্যে আজমীরীতে প্রেরণ করেন। খাজা সাহেবের আগমনে হিন্দুস্থানে পবিত্র ইসলামের মহান্ গৌরব অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি উক্ত খাজা সাহেবের প্রতি শত সহস্রবার সালাম জানাইতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাধন-বল

সাধনা-বল না থাকিলে মানব কখনই অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অলী আওলিয়া বা সাধু ব্যক্তিদের অলৌকিক ক্ষমতার কাছে, ধনী, নির্ধনী, রাজা, প্রজা সকলেই পরাস্ত। ইঁহাদের কাছে কাহারও কোন প্রকার বল প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই যাঁহাদের নিকট যাদুবিদ্যা তন্ত্রমন্ত্র কোনটাই কিছু খাটে না, তাঁহারা সহজেই কি ঐ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন ? কখনই না। তাঁহারা অনন্ত বিশ্বপালক খোদাতালার বহু সাধনা, ভজনা ও আরাধনা করিয়া এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন দিবারাত্র এবাদত, বন্দেগী করিয়া, তাঁহারা জগতের সকল মানব হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিয়াছেন পৃথিবীর সকল মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া মোরাকেবা, মোসাহেদা করিয়া, তাঁহারা খোদার প্রিয়পাত্র হইয়াছেন

খোদাতালার এবাদত, বন্দেগী, মোরাকেবা, মোসাহেদার নিয়মাবলী প্রধানতঃ চারি তরিকায় বিভক্ত।

১ম তরিকা "কাদ্‌রীয়া" পীর হজরত আবদুল কাদের জীলানী (বড় পীর সাহেব)।

২য় তরিকা "চিশ্‌তীয়া" পীর হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) আলায়হে।

৩য় তরিকা "নক্‌সাবন্দীয়া" পীর হজরত বাহাউদ্দীন (রঃ) আলায়হে।

৪র্থ তরিকা। "মজদ্দদিয়া" পীর হজরত মজদ্দদিয়া আলফে-ছানী সরহেন্দ (রঃ)

(বয়েত)

সুফিয়াঁরা রহ্‌নামহোঁ-আউলিয়ারা রহ্‌বরী।
হজরতে খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী সনজরী।

হজরত খাজা-মঈনদ্দীন চিশ্‌তীর

জন্ম বিবরণ।

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) জন্মস্থান শিস্‌স্থান সীমন্তের অন্তর্গত চিস্ত নামক সহরের মধ্যে সনঞ্জর গ্রামে। পিতার নাম সৈয়দ হজবত খাজা গিয়াসুদ্দীন আহাম্মদ সনঞ্জরী। ইনি একজন "মশায়েখ" কেবার মহ'ন্‌ ওলী'ছিলেন। মা'তা'র নাম, সৈয়দা উম্মোল ওয়ারা বিবি ইনি হাসেনী ও হোসেনী বংশের তাপস রত্ন চুড়ামণি এই সৈয়দা উম্মোল ওয়ারার যখন সমধিক বয়স, তখন হজরত খাজা সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে অতি শুভক্ষণেই ৫৩৭ পাঁচশত সাইত্রিশ হিজরীর রজব মাসের ১৪ তারিখে, সোমবার দিবসের প্রাতঃকালে ভূমিষ্ট হন হজরত খাজা সাহেব চিশ্‌তীয়া তরিকাতেই সকল মুরিদানদিগকে বয়েত করাইতেন। কেন না অনেকেই বলেন যে, ঐ দেশে চারিজন সাধুপুরুষ জন্ম গ্রহং করিয়া, আবার ঐ দেশেই মৃত হইয়াছেন প্রথম খাজা আবু আহাম্মদ চিশ্‌তী, দ্বিতীয় খাজা নাসিরুদ্দীন আবু মোহাম্মদ চিশ্‌তী, তৃতীয় খাজা আবু ইউসুফ চিশ্‌তী, চতুর্থ খাজা কুতবদ্দীন মাহুদ চিশ্‌তী (রঃ) ইঁহাদের মাজার শরিফ ঐ চিশ্‌তে সহরেই বর্ত্তমান আছে।

হজরত খাজা সাহেবের পিতৃ নসব নামা।

হজরত খাজা সাহেব মহান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন যে হেতু-উহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নসব নামা, হজরত আলি করমুল্যা অজহু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় প্রথম হজরত খাজা মঈনদ্দীন হোসেন সনজরী (রঃ) দ্বিতীয় এবনে— হজরত খাজা গিয়াসুদ্দীন আহাম্মদ (রঃ) তৃতীয় এবনে— সৈয়দ হজরত খাজা কামালুদ্দীন (রঃ) চতুর্থ এবনে—সৈয়দ হজরত আহাম্মদ হোসেন (রঃ) পঞ্চম এবনে—সৈয়দ তাহির (রঃ) ষষ্ঠ এবনে—সৈয়দ হজরত আবদুল আজিজ (রঃ) সপ্তম এবনে—সৈয়দ হজরত এব্রাহিম (রঃ) অষ্টম এবনে—সৈয়দ হজরত এমাম মুসা আলী রেজা (রঃ) নবম এবনে—সৈয়দ হজরত এমাম মুসা কাজেম (রঃ) দশম এবনে—সৈয়দ হজরত এমাম জাফর সাদেক (রঃ) একাদশ এবনে—সৈয়দ হজরত এমাম মোহাম্মদ বাকের (রঃ) দ্বাদশ এবনে—সৈয়দ হজরত এমাম জয়নাল আব্‌দিন (রাজিঃ) ত্রয়োদশ এবনে—সৈয়দ হজরত এমাম হোসেন সাহাদতে কারবালা (রাজিঃ) চতুর্দ্দশ এবনে —হজরত আলি মোর্ত্তজা "সেরে খোদা" আলায়হেসসাল্লাম।

খাজা সাহেবের মাতৃনসব নামা।

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) মাতা হজরত সৈয়দা উম্মোলওয়ারা, তাঁহার পিতা সৈয়দ হজরত দাউদ (রঃ) তাঁহার পিতা—সৈয়দ আবদুল্লা হাম্বলী (রঃ), তাঁহার পিতা—সৈয়দ হাজরত এহিয়া জাহেদী (রঃ), তাঁহার পিতা—সৈয়দ হজরত মোহাম্মদ মুবস্‌ (রঃ), তাঁহার পিতা—সৈয়দ হজরত দাউদ (রঃ), তাঁহাব পিতা—সৈয়দ হজরত মুসা (রঃ) তাঁহার পিতা—সৈয়দ হজরত আবদুল্লা মোহজ (রঃ) তাঁহার পিতা—সৈয়দ হজরত হোসেন মোসনা (রঃ) তাঁহার পিতা—হজরত এমাম হোসেন / রাজি আল্লাহ আনহুম ; তাঁহার পিতা—হজরত আলী মোর্ত্তজা "সেরে খোদা" আলায়হেসসাল্লাম।

হজরত খাজা সাহেবের বাল্যাবস্থা।

হজরত খাজা মঈনদ্দীন সাহেবের সবিশেষ বিবরণ কোন কেতাবের মধ্যে বেশী পাওয়া যায় না, তবে তিনি বাল্যকালে বেশ শান্ত শিষ্ট ছিলেন, কোন বালকের সহিত পথে ঘাটে খেলা করিয়া বেড়াইতেন্ না ; পিতার সম্পত্তি না থাকায় বাল্যকালেই অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তথাপি তাঁহার প্রফুল্ল বদন কখনও মলিন হইত না বাল্যকালে কোন মাদ্রাসায় গিয়া এলেম শিক্ষা করিতে বিশেষ সুবিধা পান নাই, কিন্তু যাঁহারা ওলী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অসীম খোদা প্রেমের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। হজরত খাজা সাহেব সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালেই নামাজ রোজা ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ যত্নবান ছিলেন, এবং সংসারের কাজকর্ম্ম করিতেও বিশেষ চেষ্টা পাইতেন, আর সময়ে সময়ে পিতার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে যাইযা মেওযা ফলের বৃক্ষে জল সেচন করিতেন কিন্তু বিধির বিধান অখণ্ডনীয়, ৫৫২ পাঁচশত বায়ান্ন হিজরীতে খাজা গিয়াসুদ্দীন আহাম্মদ (রঃ) সামদেশে তীর্থ ভ্রমণে গিয়া দেহত্যাগ করেন ঐ সাম দেশেই তাঁহার পবিত্র মাজার শরিফ। যাঁহারা বয়তল মকদ্দসে গমন করেন, তাঁহারা ঐ পবিত্র মাজার শরিফ জিযারত করিয়া আইসেন। খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ)

পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, শোকে-দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু হায় বিধির নিয়ম অলঙ্ঘণীয়। খাজা সাহেবের এই নিদারুণ পিতৃশোক নিবারণ না হইতেই আবার একটি মহাশোকের ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া তুলিল তাঁহার স্নেহময়ী জননীও তাঁহাকে দুঃখ-পাথারে ভাসাইয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। খাজা সাহেব মাতাপিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, অকুল দুঃখ সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন।

হজরত খাজা সাহেব পনর বৎসর বয়ক্রমে মাতাপিতা হারাইয়া, এতিম অবস্থায় মহাকষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন। পিতার সম্পত্তির মধ্যে কেবল একটি বাগান আর একপণ ময়দা পেষণ কর চাকি যন্ত্র প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন বাগান ও একটি চৌকি প্রাপ্ত হইযাছিলেন খাজা সাহেব মাতাপিতার বিয়োগ যন্ত্রণাজালে জড়িত থাকা সত্বেও ঐ বাগানটীর কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন এবং বাগানের নানা প্রকার মেওয়া বিক্রয় করিযা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সনজর গ্রামে একজন মজ্জুব ছদ্মবেশী ফকির বাস করিতেন; তাঁহার নাম এব্রাহিম কুন্দজী। ইনি—যে, মারফৎ বিস্তায় মহা পারদর্শী ছিলেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না যাহাতে তাঁহার সাধুত্ব প্রকাশ না পায়, তাহার জন্য তিনি পাগল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন একদিন তিনি হঠাৎ খাজা সাহেবের বাগানের ধারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন ঐ সময খাজা সাহেব ছোট ছোট বৃক্ষের মূলদেশে জল ঢালিতেছিলেন হঠাৎ ঐ

সাধু পুরুষকে দেখিতে পাইয়া, আনন্দমনে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, ও সালাম করিয়া পদচুম্বন করতঃ বসিবার আসন দিলেন তৎপরে বাগান হইতে কতকগুলি আঙ্গুর ও আনার ইত্যাদি মেওয়া লইয়া অতি সম্মানের সহিত ফকিরের সম্মুখে রাখিলেন তিনি উহার কয়েকটী ফল আহার করিবার পরে আপনার জাম্বিল হইতে একটী ফল বাহির করতঃ তাহা দন্তে চিবাইয়া খাজা সাহেবকে খাইতে দিলেন। যখন তিনি ফকিরের প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে সংসারের মায়া মমতা উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার সন্ধান রহিল না ঐ ফল ভক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া যেন একটা নুরের আলোক হৃদয়ে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হায়, সাধুপুরুষদিগের কি বিচিত্র লীলা, যাঁহার প্রতি স্নেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাকে নিমিষ মধ্যে আপন দলভুক্ত করিয়া লন তখন আর খাজা সাহেবের বিষয়-সম্পত্তি ও সখের উদ্যানের প্রতি মন নাই, সাধুর সঙ্গলাভে নিমিষ মধ্যেই খোদাপ্রেমে মন গলিয়া গেল এবং বিষয়-সম্পত্তি খোদাপথে লুটাইযা দিয়া, ফকিরী বেশে এলেম শিক্ষামানসে বোখারাভিমুখে গমন করিলেন

পৃথিবীর মায়াডোর ছিঁড়িল যে জন।
পরম সাধুর পদ লভিল সে জন॥

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) দুনিয়ার কুহকজাল ছিন্ন করিয়া ৫৫৩ হিজরীতে সমরকন্দ হইয়া, বোখারা নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বোখারা নগরে হজরত হেসামদ্দীন বোখারী (রঃ) নিকটে প্রায় ছয় সাত বৎসর থাকিয়া হাদিস, কোরাণ, ফেকা ইত্যাদি অনেক কেতাব পড়িয়া মহা বিদ্বান হইয়া পড়িলেন। তৎপরে মারফতের এলেম শিক্ষা করিবার জন্য নেসাপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

—:০:—

খাজা সাহেব মুরিদ হইবার কথা।

নেসাপুর অধীনে হারুন নামক গ্রামে, হজরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) র বাসস্থান, ইনি মারফৎ বিদ্যায় একজন মহা শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই সাধুপুরুষের কেরামতগুলি জগৎ-খ্যাত। হজরত খাজা সাহেব ৫৬০ পাঁচশত ষাট হিজরীতে নেসাপুরে আসিয়া শওয়াল মাসের ১১ই বুধবার দিবসে জোহরের নামাজের সময় হজরত ওসমান হারুনী (রঃ) র হস্তে মুরিদ হন। তৎপরে খেলাফতি পদে নিযুক্ত হইয়া 'খেরকা' পরিধান করেন, এবং পীরের অনুমতি লইয়া বোগদাদ শরিফ যাইবার জন্য বিদায় হইলেন। প্রথমে সনঞ্জর যাইয়া হজরত খাজা নিজামদ্দীন কিব্‌রিয়া (রঃ) সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তালকিন হইয়া মারফত বিদ্যায় দীক্ষিত হন, তৎপরে বোগদাদ শরিফে যাইয়া শেখ হজরত জিয়াউদ্দীন পীর রৌগন জমির ও শেখ হজরত শাহাবদ্দীন সহরর্দ্দি (রঃ) নিকটে তালকিন হইয়া তথা হইতে কেরমান সহরে গমন করেন। কেরমানে হজরত ওহেদদ্দীন কেরমানী (রঃ) নিকটে তালকিন হইয়া, একটি "খেরকা" প্রাপ্ত হন। পুনঃরায় সেখান হইতে যুদি পর্ব্বতে যাইয়া হজরত পীরানপীর দস্তগীর শেখ আব্‌দুল কাদের জিলানী (রঃ) সহিত সাক্ষাৎলাভ করেন। মহাজলপ্লাবনের সময় এই যুদি পর্ব্বতেই হজরত নুহ্ আলায়হেচ্ছালামের জাহাজ ঠেকিয়াছিল।

এখান হইতে প্রসিদ্ধ বোগদাদ শরিফ, সাত ক্রোশ ব্যবধান। আবার এখান হইতে হামদান নগরে যাইয়া হজরত শেখ ইউসফ হাম্‌দানী (রঃ) র নিকটে তালকিন হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন এখানে অবস্থিতি করিবার পরে, তবরেজ সহরে যাইয়া হজরত শেখ আবুসৈয়দ তব্‌রেজী (রঃ) র সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে ইস্‌ফেহান দেশে যাইয়া শেখ মাহ্‌মুদ ইস্‌ফেহানী (রঃ) র নিকট কিছুদিন থাকেন।

খাজা সাহেবের-পীর সেজরা।

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তীর পীর—শেখ হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খাজা হাজীশরিফ জিন্দানী (রঃ)। উঁহারপীর—খাজা মাদুদ চিশ্‌তী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খাজা নাসিরুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) উঁহার পীর—হজরত খাজা ইউসুফ চিশ্‌তী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খাজা নাসিরুদ্দীন আবু মোহাম্মদ চিশ্‌তী (রঃ) উঁহার পীর—হজরত খাজা নাছেরদ্দীন আহাম্মদ চিশ্‌তী (রঃ) উঁহার পীর—হজরত খাজা ইস্‌হাকশামী মারফত চিশ্‌তী (রঃ) উঁহার পীর—হজরত খাজা মম্‌শাদ দিনওয়ারী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খানে হবিব বস্‌রী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খাজা হাফিজা মরয়াশি (রঃ)। উঁহার পীর—সুলতান এব্রাহিম-আদহাম বল্‌খী (রঃ)। উঁহাব পীর—হজরত খাজা ফজিল-ইয়াজ (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খাজা হবিব আজ্‌মী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত খাজা হাসেন বসরী (রঃ)। উঁহার পীর—হজরত আলী করমূল্যা অজহু। ইঁনি হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (সঃ) হইতে মুরিদ হইয়া মারফতের এলেম লাভ করিয়াছিলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের খেলাফতি পদ প্রাপ্ত।

"আনিসেল আরওয়াহ্" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, নানাদেশ ভ্রমণের পরে, হজরত খাজা সাহেব পীরের সাক্ষাৎলাভের জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠেন। অবশেষে বোগদাদ শরিফে যাইয়া পৌঁছিলেন তথায় বহু অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, হজরত ওসমান হারুনী (রঃ), হজরত জোনেদ বোগদাদী (রঃ) র মসজিদে নামাজ পড়িবার জন্য গিয়াছেন খাজা সাহেব পীরের সন্ধান পাইয়া সেই মসজিদের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করতঃ পীরের পদচুম্বনপূর্ব্বক মারফত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। খাজা সাহেব স্বয়ং একথা বলিয়াছেন,—তখন তিনি আমাকে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে আদেশ করিলেন। আমি পীরের আজ্ঞানুসারে রীতিমত ওজু করিয়া তখনই দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া লইলাম। তৎপরে তিনি বলিলেন,—বাবা মঈনদ্দীন! কেবলামুখে বসিয়া অগ্রে একুশ বার দরুদ শরিফ,. তৎপরে সুরা বকর ও বিশবার কলেমা সোব্হানাল্লাহ্ পড় আমি একে একে সকলই যখন পড়িয়া শেষ করিলাম, তখন তিনি আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, খোদাতালা আজ হইতে 'আমার শিষ্য

মঈনদ্দীনকে তোমার কাছে সঁপিয়া দিলাম।' ইহার পরে একখানি কাঁচি লইয়া আমার মস্তকের চুল মুড়াইয়া দিয়া, নিজের পাগড়ীখানি আমার মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন। পরে নিজের একখানি কম্বল পাতিয়া দিয়া, তাহাতে বসিতে আজ্ঞা দিয়া বলিলেন; একদিবারাত্র পর্য্যন্ত উহাতে বসিয়া "মোজাহেদা" কর। এবং সুরা এক্‌লাস উহার সঙ্গে হাজারবার পড়। আমি পীরের আজ্ঞামত "মোজাহেদা ও মোসাহেদায়" বসিলাম; ক্ষণকাল পরে আমার চক্ষের পর্দ্দা খুলিয়া গেল, চক্ষের আবরণ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই "মোসাহেদায়" থাকিয়া সপ্ততল আকাশ পাতালের মধ্যবর্ত্তী যাহা কিছু; এমন কি "তাহ্‌তাস্‌সারা" আমার নয়ন পথে নিপতিত হইল।

"খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) সওয়ানিয়ে উমরী"র মধ্যে লিখিত আছে, দ্বিতীয় দিবসে হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) খাজা সাহেবকে বলিলেন, আমার সঙ্গে স্থির ও ধীরভাবে মোরাকেবায় বসিয়া যাও, উভয়ে মোরাকেবায় বসিলে, হজরত ওস্‌মান হারুনী বলিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, এখন কি দেখিতে পাও; খাজা সাহেব আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এখন আমি "আল্লার-আরশ" পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি তিনি আবার নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, সমুদয় পাতাল ভূমি মানচিত্রের ন্যায় বেশ সুস্পষ্ট দর্শন করিতেছি হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) সেইদিন তাঁহাকে মোরাকেবা এই পর্য্যন্তই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তাহার পরদিবশ হজরত খাজা সাহেব হাজারবার সুরা এখ্‌লাছ পড়িয়া পীরের সঙ্গে মোরাকেবায় বসিলেন। হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) বলিলেন, বাবা মঙ্গনদ্দীন! আমার সাহাদত অঙ্গুলীর দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ ত? খাজ সাহেব পীরের অঙ্গুলীর উপরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, সমুদয় পৃথিবী, আকাশ পাতাল পীরের সাহাদত অঙ্গুলীর উপরে বিরাজ করিতেছে এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া যখন পীরকে জানাইলেন, তখন তিনি বলিলেন,—মঙ্গনদ্দীন! এতদিন পরে তুমি মারফত বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলে, এবার হইতে তুমি তালকিন করিবার উপযুক্ত পদ প্রাপ্ত হইলে, এখন তোমার সাধনাকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। এই বলিয়া তিনি খাজা সাহেবের সম্মুখে যেমন একখানি ইট রাখিয়া দিলেন অমনি উহা খাটি স্বর্ণে পরিণত হইয়া গেল। খাজা সাহেব পীরের আদেশ মত ঐ স্বর্ণ ইষ্টকখানি দরিদ্রদিগকে দান করিলেন।

খাজা সাহেব পীরের সহিত হজব্রতে গমন করেন।

প্রসিদ্ধ তওয়ারীখের মধ্যে লিখিত আছে হজের সময় হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) খাজা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া পবিত্র মক্কা শরিফে গমন করিলেন। কাবাশরিফ তওয়াফের পরে হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) বাবল রহ্‌মতে হাত উঠাইয়া খাজা সাহেবের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময়. দৈববাণী হইল, মঈনদ্দীন আমার প্রকৃত বান্দা তজ্জন্য আমি উহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর একদিন একাকী খাজা মঈনদ্দীন (র) কাবা শরিফ তওয়াফ করিতে ছিলেন, এমন সময় দৈবাৎ একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন যে, 'মঈনদ্দীন! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এসময় তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহা পূর্ণ করিয়া দিব। খাজা সাহেবতখনই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে খোদাতায়ালা! মঈনদ্দীন ও মঈনদ্দীনের তরিকা অনুযায়ী সেলসেলা মুরিদান দিগকে অনুগ্রহ করিয়া বখ্‌শাইয়া দিও পরম খোদাতায়ালা দয়া করিয়া তখনই তাহা কবুল করিয়া লইলেন।

খাজা সাহেব পীরের সহিত মদিনায় গমন করেন।

খাজা সাহেব আপন পীরের সমভিব্যাহারে মক্কা হইতে যখন পবিত্র মদিনা শরিফে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন হজরত ওস্‌মান হারুনী রহমতুল্যা আলায়হে, খাজা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, হজরত রসুল করিম (সঃ) মের পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করিতে দাঁড়াইলেন এবং খাজা সাহেবকে হজরত রসুলমক্‌বুল (সঃ) উপরি সালাম করিতে বলিলেন হজরত খাজা মঈনদ্দীন (রঃ) যখন ভক্তিভরে বলিলেন, "আস্‌সালাম্ আলায়কুম ইয়া-রসুলোল্লাহ্" অমনি রওজা শরিফ হইতে জবাব আসিল, "অয়ালায়কুম আস্‌সালাম" ইয়া কুতবল্ মশায়েখ, পবিত্র রওজা শরিফ হইতে যে সালামের জবাব আসে তাহা হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) পর্য্যন্ত শুনিতে পান। জিয়ারতের কার্য্য শেষ হইলে, হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) খাজা সাহেবকে বলিলেন? এখন তোমাকে আমি খোদাতায়ালার হাতে অর্পণ করিলাম? তুমি দেশ দেশান্তরে গিয়া পৃথিবীর লোকদিগকে হেদাএত করিবার জন্য, এখান হইতে শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাও খাজা সাহেব পীরের আজ্ঞানুসারে মদিনা সরিফ হইতে বিদায় হইয়া দেশ দেশান্তরে অনেক লোককে উপদেশ দান করিয়া মুরিদ করিতে লাগিলেন।

খাজা সাহেবের হস্তে কুতবুদ্দীন বখ্‌তীয়ার কাকী (রঃ) মুরিদ হইবার কথা।

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) যখন যে শহরে যাইয়া উপস্থিত হইতেন, তখনই তাঁহার কাছে অধিক লোকের সমাগম হইত, কিন্তু যেখানে লোকের ভিঁড় অধিক হইত তথা হইতে তিনি অন্যত্র গমন করিতেন যখন তিনি উশ নগরে যাইয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানে অধিকাংশ লোক হুজুরের "ফায়েজ" গ্রহণ করিতে লাগিল ঐ সময় খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তীয়ার কাকী (রঃ) আবা-হাফেজ (রঃ) মাদ্রাসায় পড়িতেন। তিনি খাজা সাহেবের কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই যাইয়া খাজা সাহেবের হস্তে মুরিদ হইলেন, এবং কিছুদিন পীরের সহবাসে থাকিযা (গুপ্ত-তত্ত্ব) মারফত বিদ্যালাভ করেন। ইনি খাজা সাহেবের প্রথম খলিফা— বিশ বৎসরের কম বয়সে মুরিদ হইযা ছিলেন। সে সময় তাঁহার গোপ, দাড়ী বাহির হয় নাই। মুরিদ হইবার পরে ইনি দুই শত পঞ্চাশ রাকাত নামাজ ও তিন হাজার বার দরুদ শরিফ পড়িতেন কখন কখন দিল্লীর জামে মস্‌জিদে দুই রাকাত নফল নামাজের মধ্যে সমুদয় কোরাণ শরিফ খতম করিতেন। বখ্‌তীয়ার কাকী (রঃ) এমন দর্জার পীর হইয়া ছিলেন যে, প্রত্যহ চল্লিশজন কেবল খাস্‌ লোককে মুরিদ করিয়া তাঁহাদিগকে মারফত বিদ্যায় উপযুক্ত করিয়া ছাড়িতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেব মুরিদান দিগকে শুভ সংবাদ দেন।

"সানায়েল" নামক কেতাবের মধ্যে লিখিত আছে, হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আমার হস্তে কিম্বা আমার খলিফার হস্তে মুরিদ হইবেন, তাঁহাদিগকে আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গে লইয়া না যাইব তৎক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গের দ্বারে পা রাখিব না তিনি ইহাও বলিযাছেন, যে সময় আমি পবিত্র মক্কা শরিফে গিয়া কাবার তওয়াফ করি, ঐ সময় এইরূপ দৈববাণী শুনিলাম যে, 'মঈনদ্দীন আমি তোমার উপর অধিক সন্তুষ্ট হইলাম এবং তোমাকে আর, তোমার পরিবারবর্গ 'আহ্‌লে বয়েত' দিগকে বখ্‌শাইয়া দিলাম।" তখন আমি বলিলাম, হে দাতা, দয়ালু দয়াময়! আপনার কৃপা দৃষ্টির প্রতি এই আশা রাখি যে, আমার সমুদয় মুরিদ গুলি যেন, বিনা হিসাবে বখ্‌শা যায়।' অমনি প্রত্যাদেশ হইল; হে বন্ধু মঈনদ্দীন! তোমার মুরিদ এবং তোমার মুরিদানের মুরিদ তাঁহারাও আমার রহমতের ছায়ায় পড়িয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বখ্‌শা যাইবে।

একদা খাজা সাহেব বোগদাদ শরিফ যাইবার কালে, খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তীয়ারী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া যান। তিনি বোগদাদ শরিফে পৌঁছিয়া তথায় একটী হোজরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পাঁচ মাস সাত দিন ছিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে হজরত 'গওসল আজম' বড় পীরসাহেবের সঙ্গে প্রায় প্রত্যহ দেখা করিতেন। হজরত বড় পীর সাহেব কুতবদ্দীন বখ্‌তীয়ার কাকী রহমতুল্লাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, মঈনদ্দীন! আমি দোয়া করিতেছি কুতবদ্দীন নিশ্চয় এক সময়ে একজন মহা ওলী হইবে এবং উহার সঙ্গলাভ করিয়াও বহু লোক মারফতে কামেল হইয়া ফকিরীপদ প্রাপ্ত হইবে। ফলে হজরত বখ্‌তীয়ার কাকী, খাজা সাহেবের কাছে খেলাফতী পদ প্রাপ্ত হইয়া একজন উচ্চ দর্জ্জার আওলিয়া হইয়া ছিলেন। হজরত খাজা সাহেব পাঁচ মাস সাত দিন পরে বোগদাদ হইতে বদখ্‌শান সহরে যাইবার সময় হজরত কুতবদ্দীন বখ্‌তীয়ার কাকী রহমতুল্লাকে উশ্‌ নগরে পাঠাইযা দিলেন এবং আপনি বদখ্‌শান সহরে গিযা তথায কয়েক দিবস থাকিলেন ঐ সময় হুজুরের সঙ্গে একটী খোঁড়া ফকির সাক্ষাৎ করিতে আসেন। হজরত খাজা সাহেব তাঁহার এক পদ কাটা দেখিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই দরবেশ! তোমার ঐ ডানদিকের পদটী কাটা কেন? ইহার কারণ কি? আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

সেই দরবেশ বলিলেন, হুজুর! আমি হজরত মহাত্মা জুনেদ বোগদাদী (রঃ) র বংশধর; আমার বয়স প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর

হইয়াছে আমি এক সময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হোজরা গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং খোদাতায়ালার উপাসনা করিয়া এই গৃহের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া মনে মনে খোদাতায়ালার কাছে সংকল্প করিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার বন্দেগী করিতে নিযুক্ত হই; কিন্তু আমি জরুরাত কার্য্য ব্যতীত কখনই নফ্‌সের বশবর্ত্তী হইয়া হোজরা গৃহ হইতে বাহির হইতাম না। সেই অবস্থায় বার বৎসর কাল অতীত হইয়া গেলে, বসন্তকালে উদ্যানের শীতল বায়ু সেবন করিবাব নিমিত্ত মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে; ঐ সময় নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মরণ হইয়া নফ্‌সের প্রলোভনে পড়িয়া, বাগানে যাইতে যেমনই গৃহ হইতে একপদ বাহিরে যাই— অমনি দৈবশব্দ (প্রভূবাণী) শুনিতে পাইলাম; "হে তাপস প্রবর! কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? আজ সেই প্রতিজ্ঞা ছিন্ন করতঃ পরম হিতৈষী বন্ধুকে ছাড়িয়া সুখের মলয় বায়ু সেবন করিতে চলিলে যে ব্যক্তি পরম বন্ধুর মিলনহার ছিন্ন করিয়া অন্যের সহিত মিলন করিতে চায়, সে কেমন বন্ধু! যে প্রেমময় মিলন গৃহ ত্যাগ করিয়া উদ্যানের শীতল বায়ু সেবনের ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃত বন্ধু হইতে পারে না। হজরত! যখন "আমি এই শব্দ কর্ণে শ্রবণ করিলাম, তখন মনস্তাপে দগ্ধিভূত হইয়া উত্তেজিত নফ্‌সের শাস্তি করিবার জন্য তখনই এই ডান পদটীকে কাটিয়া ফেলিলাম। ইহা আজ চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। জানি না

পরকালে এই পাপ মুখ খোদাকে কেমন করিয়া দেখাইব? এই অন্যায় কার্য্যের জন্য আমার অত্যন্ত লজ্জা ও মনস্তাপ হইতেছে; এবং সেই অবধি আমি এক দিনের জন্যও সুস্থির হইতে পারিতেছি না; সর্ব্বদাই চিন্তানলে দগ্ধীভূত হইতেছি

(মস্‌নবী)

মোহব্বাত গ্যারশুদ্দ, জাহেল্ল বা সুল্লাত।
হামাঁ সুল্লাত শুদ্দ, আশক্ জল্লল্লাভ

মারফতে কামেল হইতে গেলে দশটী কার্য্য করা অতি আবশ্যক, তবেই নফ্‌সের কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারিবে। যথা—

১ কুপথ ত্যাগ কবিয়া সৎপথ অবলম্বন করা।

২ আওলিয়ার সহবাসে থাকিয়া, কুসঙ্গ ত্যাগ করা।

৩ কাহাকেও শত্রু জ্ঞান না করিয়া; সকলকেই বন্ধু জ্ঞান করা।

৪। অন্যকে মন্দ না জানিয়া নিজকেই সকল হইতে মন্দ জানা,

৫ ক্ষুধা পিপাসায়, কি বিপদ সময়ে অধৈর্য্য না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করা।

৬। কখন কাহাকে ক্লেশ না দিয়া সকলের উপকারে নিজের জীবন অতিবাহিত করা।

৭। জ্ঞান থাকা সত্ত্বে পাচ ওয়াক্তের নামাজ পড়া কখনই ত্যাগ না কবা

৮। উদরপূর্ণ করিয়া আহার না করা, এবং ছয় দিন ব্যতীত বৎসরের সকল দিন রোজা রাখা।

৯ মৃত্যুকে অতি নিকটবর্ত্তী জানা, এলেমকে দখলে রাখা, ও শরিয়তের আদেশ গুলি সম্পূর্ণ পালন করা।

১০। দুনিয়ার অসার আমোদ ফকিরের হৃদয়ে স্থান না দেওয়া এবং বাহ্যিক আড়ম্বর কাহাকেও না দেখান।

প্রকৃত আরেফের অন্তরে কিছুই স্থান পায় না, কেবল খোদার এস্ক-অনল প্রানের মধ্যে জ্বলিতে থাকে, সে জন্য ঐ প্রাণে অন্য কোন বস্তু প্রবেশ করিতে গেলে, পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। লোকে উপযুক্ত সাধুপুরুষ তখন হইতে পারিবে, যখন সৎ বিষয় গুলি মনে ধারণা করিবে। আর কেহ যদি কিছু সওয়াল করে তখনই তাহার উত্তর দিতে পারিবে এমন কোন লোকের সাধ্য নাই যে, হঠাৎ আওলিয়ার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারে কেননা হাজি লোক বৎসরে একবার কাবা শরিফ তাওয়াফ করেন; কিন্তু আল্লার ওলী যাঁহারা, তাঁহারা মনে করিলেই পবিত্র কাবা তওয়াফ করিতে পারেন দ্বিতীয়, ওলীর দেলে প্রত্যহ খোদার পবিত্র (তাজাল্লি) শত হাজার বার পতিত হইয়া থাকে এবং ক্রমে উহা একটি উজ্জল আলোক হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তাঁহারা উহা জগতে একবিন্দু প্রকাশ হইতে দেন না। তৃতীয়, ওলিআল্লাগন দুইটী অঙ্গুলীর মধ্যে খোদাতায়ালার সমুদয় সৃষ্টি মধ্যে যাহা কিছু তৎসমুদয় বস্তুই জ্ঞান চক্ষে দর্শন করেন। কিন্তু খোদাতায়ালাকে

কোন প্রকারে দেখিতে পান না। এরূপ কঠিন সাধনা করিয়া এমন অলৌকিক বল লাভ করিতে না পারিলে কি মানুষ কখন ওলীআল্লা হইতে পারেন? কিন্তু আজকাল কত শত ভণ্ড ফকিরগণ নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, গাঁজায় দম দিয়া গজল গাইয়া বলে, "আমি ফকিরি লাভ করিয়া ওলীআল্লা হইয়াছি এবং খোদাতায়ালাকে প্রায়ই দেখিয়া থাকি।" —নাউজ বিল্লা মেনহা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের রেয়াজত

তওয়ারীখ ফেরেস্তার মধ্যে লিখিত আছে, হজরত কুতবদ্দীন বখ্‌তীয়ার কাকী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে,—"আমার পীর গুণধর তাপস প্রবর হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) "ছায়েমাল-নহরে" ও "কায়েমাল লায়লে" ছিলেন " ছায়েমাল নহরে অর্থাৎ সাতদিন রোজা রাখিয়া একদিন এপ্তার করিতেন, যে রুটীর ওজন পাঁচ তোলা এক মাসা ছিল এমন এক খানি রুটী পানীর সহিত গুলিয়া পান করিতেন কেননা তিনি পান-আহারের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না তিনি অতি মোটা বস্ত্র পরিধান করিতেন কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে তৃণ দিয়া সেলাই করিতেন, সুতার অপেক্ষায় থাকিতেন না। পিরহানে বোতাম ও ঘুণ্টির পরিবর্ত্তে কখন কখন কাঁটা ব্যবহার করিতেন। 'কায়েমাল লায়লে' অর্থাৎ মগরবের পূর্ব্বে ওজু করিয়া ফজরের নামাজ পর্য্যন্ত পড়িয়া লইতেন। তাঁহার রাত্র জাগরণ করিবার এইরূপ নিয়ম ছিল রাত্রিকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেন; রাত্রের প্রথম ভাগে—নফল নামাজ পড়া, দ্বিতীয় ভাগে—খোদার জেকেরে লিপ্ত থাকা, তৃতীয় ভাগে, শেষ রজনীতে—কোরাণ তেলাওত করা। সোব্‌হানাল্লা! হুজুর কি কঠিন রেয়াজতে নিযুক্ত থাকিতেন।

জনাব মৌলভী আবুল ফখর আকবরাবাদী সাহেব নিজের কেতাবের মধ্যে লিখিয়াছেন যে,—"খাজা সাহেব প্রত্যহ দিবা রাত্রের মধ্যে তুইবার কোরাণ খতম করিতেন ; ফজরের নামাজ পড়িয়া পাঁচশতবার তওবা লাহাওলা, পাঁচশতবার 'দরুদ শরিফ', পাঁচশতবার 'কলমা সাহাদত' পরে এশরাকের নামাজ, তৎপরে দশ রাকাত দোগানা-নামাজ, পুনঃ দশবার দরুদ শরিফ পড়িয়া বার রাকাত চাস্তের নামাজ পড়িতেন। পরে এক শতবার দরুদ পাঠ করিয়া 'কোরাণ শরিফ তেলাওত' করিয়া পরে 'এস্তেহাজার' নামাজ পড়িতেন। ইহার পরে রাত্রি-কালে হজরত খাজের আলায়হের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য দশ রাকাত 'সালাত খাজের' নামাজ পড়িয়া হজরত খাজের (আঃ) র সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। ইহা ভিন্ন রাত্রে একশত বারঃ সুরা ফতেহা পাঠ করিয়া হাফেজল ইমান' তুই রাকাত ও 'সালাত আওয়াবিন' ছয় রাকাত আদায় করিয়া, আবার দরুদ পড়িয়া, এশার নামাজ পাঠ করিতেন। খাজা সাহেব নিজে এইরূপ এবাদত করিতেন এবং চিশ্‌তীয়া তরিকার ফকির দরবেশদিগকে এই নিয়মে এবাদত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আজকাল চিশ্‌তীয়া তরিকার ভণ্ড ফকিরগণ এই সকল এবাদতে শুন্সি ত্যাগ করিয়া, কেবল সরার নিষিদ্ধ কাওয়ালী গান করিতে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। হজরত খাজা সাহেবকে এক সময় কোন শাসন কর্তার অধীন হইতে একটি লোক আসিয়া বলেন,—"হুজুর! আমি একটী চোরকে একবার ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম পুনরায় সে

চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে। এখন তাঁহাকে কি করিব বলুন? আপনি সরিয়তের আইন অনুসারে তাঁহার হাত কাটিবার জন্য ফতওয়া লিখিয়া দেন, তাহা হইলে সে উচিত মত শাস্তি পায়। হুজরত বলিলেন, 'আমি নিজেই গোনাগাব, আমার নিজের দশা কি হইবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির; আবার অন্যের শাস্তির জন্য কেমন করিয়া ফতওয়া লিখিয়া দিব? ইহা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তোমরা কোন কাজীর কাছে গিয়া চোরের শাস্তিব উপায় দেখ।' 'সোব্‌হানাল্লা!' যাঁহার উপাসনা-আরাধনার সংখ্যা করা যায় না, তিনি নিজেকে এত ছোট বা হীন জানিতেন, একজন চোর অপেক্ষাও নিজের হীনতা প্রকাশ করিয়াছেন।

হজরত ওস্‌মান হারুনীর একটী কেরামত।

তওয়ারীখ ফেরেস্থা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একদা হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) সাহেব বিদেশ ভ্রমণার্থে স্বীয় আবাস হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে থাকেন, সমস্ত দিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী বৃক্ষতলে যাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে আহারের জন্য তাঁহার সঙ্গের খাদেম ফখরুদ্দীনকে কহিলেন,—ফখরুদ্দীন ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছে। অতএব তুমি শীঘ্র শীঘ্র কিছু আহারের বন্দোবস্ত কর। ফখরুদ্দীন পীরের আজ্ঞানুসারে কাবাব ও রুটী তৈয়ার করিবার নিমিত্ত অদূরে আগুন জ্বলিতেছে দেখিতে পাইয়া, তথায় যাইয়া একটু আগুন চাহিলেন। মুজসিগণ কহিল, 'ইহা সাধারণ অগ্নি নহে যে, তোমাকে দিব এ অগ্নি আমাদের পূজিত দেবতা, ইহা হইতে একটুও আগুন পাইবার আশা করিও না। ফখরুদ্দীন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) কে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া কহিলেন

তিনি এই কথা শ্রবণ মাত্রে মুজসিগণের অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের দলের প্রধান যাজক বৃদ্ধ মখ্‌তারকে ডাকিয়া কহিলেন, 'হে মখ্‌তার ! কেন তোমরা অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতায়ালাকে না পূজিয়া কেবল অগ্নি

পূজা করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় পরিচয় দিতেছ? মখ্‌তোর কহিল, হুজুর! মুজসিগণের এই অগ্নিই প্রধান দেবতা, এই অনল দেবতার পূজা করিলেই নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব, ইহাই আমাদের বিশ্বাস তখন তিনি বলিলেন, বোধ হয় তুমি জন্মাবধি অগ্নি পূজা করিয়া আসিতেছ এবং অগ্নি হইতে তোমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, তাই অগ্নিকে এত ভক্তি কর। মখ্‌তোর কহিল, হুজুর! আশ্চার্য্য কথা, আগুন আবার কাহার ক্ষতি করে না? আগুনের স্বভাবই খলতা, আগুন ঘরবাড়ি গাছপালা, মানুষ, জন্তু ইত্যাদি, যাহা কিছু পায় তাহাই জ্বালাইয়া ভস্ম করিযা ছাড়ে তবে আমাদেব ধর্ম্ম প্রথানুসারে বাধ্য হইয়া অগ্নি পূজায় জীবন অতিবাহিত করি তখন হজরত ওস্‌মান হারুণী (রঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আগুন আমাকে যদি না পুড়াইতে পারে, তাহা হইলে তোমরা মুসলমান হইবে কিনা বল? তাহাতে তাহারা সকলেই স্বীকার পাইলে হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) মখ্‌তারের ক্রোড় হইতে তিন বৎসরের একটী শিশু লইয়া কহিলেন, "হে অগ্নি উপাসকগণ! আমি তোমাদের ন্যায় কখনই অগ্নি-উপাসনা করিনা, কেবল অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসনা করিয়া থাকি; দেখ! এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আমার একটী লোম পর্য্যন্তও দগ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না!" এই বলিয়া তিনি মুখে বিস্‌মিল্লা বলিতে বলিতে সেই শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন বালকের পিতা, ছেলের প্রাণ নাশের আশঙ্কায় বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক

হায়! হায়! শব্দে রোদন করিতে লাগিল এই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ প্রায় তিন চারি শত লোক তথায় আসিয়া বলিতে লাগিল, হায়! হায়! অকারণ মুসলমানটী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আমাদের শিশুসহ নিজের প্রাণ হারাইতে বসিল

কিন্তু করুণাময় খোদাতাযালার কি অপার মহিমা! যিনি কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার আরাধনা করেন, তিনি তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই কৃপাদৃষ্টি রাখেন! তাঁহার কৃপাদৃষ্টি গুণেই ওলী আল্লাগণ জগতবাসীগণকে অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) প্রায় চারি ঘণ্টাকাল অগ্নি-মধ্যে থাকিয়া, অক্ষত-শরীরে তথা হইতে সেই শিশুসহ বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহার কাপড়েও একটু আগুণের আঁচ, কি ধুয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত লাগে নাই। হজরতের এই কেরামত দেখিয়া সকলেই অবাক্! পরে সকল মুজসিগণই পবিত্র কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের হজ্জে গমন।

খাজা সাহেব পবিত্র হজ প্রতিপালন করিবার মনন করিয়া স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হন। রাস্তায় যাইবার কালীন তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিকাংশ লোক দিগকে সৎপথে আনয়ণ করেণ। তাঁহার অমিয়ময় মধুর উপদেশ-পুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ও মারফতের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া অসংখ্য লোক সংসারকে ত্যাগ করতঃ খোদা তায়ালার উপাসনায় মত্ত হইয়া পড়ে

খাজা সাহেব মুরিদানদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং সকলকেই সমভাবে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। দেখিতে দেখিতে পবিত্র হজ্জের সময় আসিয়া পড়িল সুতরাং তিনি হজ পালন করিবার জন্য পবিত্র মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন অতি অল্প দিনের মধ্যেই মক্কাসরিফ পৌঁছিয়া হজব্রত পালন করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি মদিনা মনোয়ারা-ভীমুখে রওয়ানা হইলেন।

খাজা সাহেবের হিন্দুস্থানের বেলায়েৎ প্রাপ্ত।

৫৬০ হিজরীতে খাজা সাহেব মক্কাশরিফে পবিত্র হজব্রত প্রতিপালন করেন পবিত্র হজব্রত সমাধান্তে মদিনা মনোয়ারাভিমুখে রওয়ানা হন। মদিনা শরিফ পৌঁছিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মের রওজাশরিফ জীয়ারত করেন এবং তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করেন। রওজা মোবারক হইতে একদিন দৈববাণী হইল যে, "খাদেম! শীঘ্র তুমি আমার রওজার পার্শ্বে মঈনদ্দীনকে ডাকিয়া আন" খাদেম দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে মঈনদ্দীন নামক অন্য একজনকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু পুনরায় হুকুম হইল, এ নয়, খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তীকে লইয়া আইস খাদেম তখন খাজা সাহেবকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পরে তাঁহাকে রওজা শরিফের পার্শ্বে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিলেন খাজা সাহেব পবিত্র রওজা শরিফের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া দোয়া সালাম পড়িতে ছিলেন, এমন সময় রওজা শরিফ হইতে শব্দ হইল, "হে কুতবল মসায়েখ. আমার পিয়ারা মঈনদ্দীন! প্রিয়তম বংশধর! আমার ইসলাম ধর্ম্মের সাহায্যকারী, আমি তোমাকে হিন্দুস্থানের 'বেলায়েত' দান করিলাম। এখন তুমি এখান হইতে আজমীর গিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, পৌত্তলিকধর্ম্ম ও

প্রতিমা পূজার ঘৃণিত কীর্ত্তি দূর করিয়া দাও তাহা হইলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে সমুদয় পৃথিবী মধ্যে আর কোথায় বাকি থাকিবে না।" তখন খাজা সাহেব বলিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ নবী (সঃ)! আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও প্রস্তুত, তবে কিনা, হিন্দুস্থান যাইবার পথ ঘাট আমার একবারেই জানা নাই, কেমন করিয়া সেখানে যাইব, তাহাই চিন্তা করিতেছি।" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে খাজা সাহেবের চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গেই রওজা শরিফ হইতে আবার পবিত্রবাণী শুনিতে পাইলেন, "তুমি মোরাকেবায় থাকিয়া হিন্দুস্থান যাইবার সমস্ত রাস্তা ঘাট স্পষ্ট দেখিয়া লও; এখন তোমাকে ঐ আজমীর পর্য্যন্ত যাইবার পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছি।" খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) মোরাকেবা করিয়া তখনই সমুদয় হিন্দুস্থানের পথ, দিল্লী ও আজমীর পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন এখন আর তাঁহার কোন চিন্তাই রহিল না। রওজা শরিফ হইতে তখনই বাহিরে আসিয়া হিন্দুস্থানে যাইবার একটী পথ ধরিয়া কয়েকজন দরবেশ সহ গমন করিলেন

ইয়াদ্‌গার মোহাম্মদ।

হজরত খাজা সাহেব যখন সজার সহরে উপস্থিত হন, তথায় একটি বাগান দেখিয়া ওজু করিয়া নামাজ পড়ার পরে কোরাণ তেলাওয়াত করিতে বসিলেন এখানকার শাসনকর্ত্তা একজন সিয়া ছিল। সে শত্রুতা বশতঃ মোহাম্মদ নাম ধারণ করিয়া, আবুবকর, উমর, ওস্মান, ও আলি নামে চারিজন সহচর সঙ্গে রাখিত সে এমন সময় ঐ চারিজন সহচর সঙ্গে বাগানে পৌঁছিলে, খাজা সাহেবকে বাগানে কোরাণ পড়িতে দেখিয়া, ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিল; "আরে ফকির! বাঁচিতে চাস্ ত, এখনই আমাব এই সখের উদ্যান হইতে পলাইয়া যা; নচেৎ এখনই আমার হস্তে প্রাণ হারাইয়া বসিবি" হজরত খাজা সাহেব যেমন তাঁহার দিকে 'জালালী ফায়েজের' সঙ্গে কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, অমনি সে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। ফকিরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া যে ইয়াদগার মোহাম্মদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা তাহার সহচরগণের আর বুঝিতে কাহার ও বাকী রহিল না। অবশেষে সকলে মিলিয়া খাজা সাহেবের পদতলে পতিত হইয়া প্রভুর জীবন লাভের জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল খাজা সাহেব সামান্য পানী পড়িয়া দিয়া কহিলেন, 'যাও এই পানী উহার অঙ্গে ছিটাইয়া

দাও এখনই চৈতন্য পাইবে।' সেই পানী লইয়া ছিটা
ইয়াদগার চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া বসিল ও খাজা সাহেবে
লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। খাজ
তাঁহাকে সিয়া মজহাব ত্যাগ করাইয়া হানিফি মজহা
করিয়া রসুলোল্লা (সঃ) মের সহিত কিরূপ মহব্বত ক
সে বিষয়ে রীতিমত তাহাকে শিক্ষা দিলেন। খাজ
শিক্ষা দিবার গুণে তাহার মন সত্যের দিকে ফিরিয়া
ধন-সম্পত্তি ছিল তাহা খাজা সাহেবের সম্মুখে আনিয়
তখন তিনি কহিলেন, যাও ঐ ধন গুলি দরিদ্রদি
করিয়া দাও। শাসনকর্ত্তা ইয়াদগার ধনৈশ্বর্য্য লুটা
পীরের নিকট হইতে মারফত লাভ করিয়া, মহা তপস্বী
হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের দিল্লী আগমন।

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) সব্‌জাওয়ার হইতে যখন গজনী যাইয়া পৌঁছিলেন, তথায় হজরত শামশুল আরেফিন (রঃ) ও আব্‌দুল ওহাদ শেখ নেজামদ্দীন (রঃ) র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া লাহোরে যাইয়া পৌঁছিলেন এখানে হজরত মখতুম আলি কুদ্দুস সরহল আজিজ (রঃ) র মাজার সরিফ জিয়ারত করিয়া, কযেক দিন বিশ্রাম করেন। এখানে অনেক লোক খাজা সাহেবের হাতে মুরিদ হইয়া, সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে এখান হইতে চল্লিশ জন দরবেশ সমভিব্যাহারে দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হন আজমীর অধিপতি পৃথ্বিরায়ের গুপ্ত চরগণ এ ভাবের ফকির দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেল, তাঁহার জোতির্ম্ময় চেহারা দর্শন করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে মহাত্রাস জন্মিল কেন তাহাদের মনের মধ্যে মহাত্রাস জন্মিয়া ছিল, 'পাঠকগণ! এখন তোমাদিগকে সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনাইতেছি ;—

হিন্দুরাজগণের মোস্‌লেম বিদ্বেষ।

'সেরে'াল আউলিয়া' নামক ইতিহাস মধ্যে লিখিত আছে, যে সময় হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) চল্লিশ জন সহচর সমভিব্যাহারে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঐ সময়ে দিল্লী ও আজমীর লইয়া রাজপুত বংশের রাজা পৃথ্বিরায রাজত্ব করিত। আজমীর হইতে দিল্লী ২৫৮ মাইল ব্যবধান পৃথ্বিরায স্বয়ং আজমীরে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, আর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাঁড়া রায়কে দিল্লীর শাসন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন পৃথ্বিরায়ের রাজত্বকালে দিল্লী ও আজমীর লইয়া কেবল হিন্দুগণই বাস করিত। কখন যদি পৃথ্বিরাজ্যে কোন মুসলমান আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে সেই মুসলমানের কষ্টের আর সীমা থাকিত না, এমন কি তাঁহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ সংহার করিতেও হিন্দুগণ কুণ্ঠিত হইত না। মুসলমান বিদ্বেষী পৃথ্বিরায় কোন সময়ে যদি মুসলমানের মুখ দেখিয়া ফেলিত। তাহা হইলে ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া তখনই তাঁহার উপরে উৎপীড়ন করিবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ দিতেন খোদাতায়ালার আদেশে পৃথ্বিরায়ের গর্ব্ব খর্ব্ব ও সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম প্রচার করার জন্যই খাজা সাহেব হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইলেন যাঁহার শুভ আগমনে আজ হিন্দুস্থানের মধ্যে ইস্‌লাম গৌরব ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুস্থানের আদিম রাজন্য বর্গ।

পাঠকগণ। প্রথমে হিন্দুস্থানে কোথা হইতে কে আসিয়া বাস করিয়া, রাজ্য সংস্থাপন করিযাছিলেন, তাহা তোমাদিগকে শুনাইতেছি তারিখ ফেরেস্তার মধ্যে লিখিত আছে মহা জলপ্লাবনের কিছুদিন পরে ইরাক সীমান্ত হইতে নুহু নবীর কনিষ্ঠ পুত্র হাম এই ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন হামের ছয় পুত্র তন্মধ্যে জোষ্ঠ পুত্র হিন্দু, ঐ হিন্দু যে স্থানে যাইযা বাস করেন, তাঁহার নাম অনুকরণে ঐ দেশের নাম হিন্দুস্থান হইল। হিন্দু একেশ্বর ধর্ম্মে থাকিয়া কখন কোন দেব-দেবী বা মূর্ত্তি পূজা করিতেন না। তাঁহার শান্ত স্বভাব দেখিয়া উহার বংশধরগণ বলিয়া ছিলেন, 'পিতাই গুরু, পিতাই ধর্ম্ম।' এই জন্য হিন্দু বংশধরগণ অদ্যাবধি আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। হিন্দুর প্রথম পুত্র পুরুব, দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গ। বঙ্গ যে স্থানে যাইয়া বাস করেন, ঐ দেশের নাম বঙ্গ বা বাঙ্গালা।

পুরুব হিন্দুস্থানের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পুত্রবৎ স্নেহে প্রজা পালন করিতেন। পুরুবের ৪২টী সন্তান। তন্মধ্যে কিশেন সকল পুত্র অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী। পুরুব, জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশেনকেই রাজ্য দিয়া পরলোক গমন করেন। কিশেনের সাইত্রিশটি সন্তান। কিশেন চারি

শত বৎসর রাজত্ব করিয়া অবশেষে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকে রাজত্ব দিয়া সংসার মায়া ত্যাগ করেন। মহারাজ সাত শত বৎসর জীবিত থাকিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলে, কিশুর রাজা হইয়া প্রথমেই রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। ঐ সময় জগৎ বিখ্যাত শামনুরিমান ইহার সাহায্য করেন। রাজা দুই শত বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে ফিরোজ রায় রাজা হইয়া পাঁচ শত সাইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করেন এই বংশে সূর্য্যরায় রাজা হয়, ও তাঁহার রাজত্ব কালে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, ও প্রতিমাদির পূজা ক্রমান্বয়ে প্রচার হইতে থাকে। ২৫০ বৎসর বয়সে বহুপুত্র রাখিয়া সূর্য্যরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় ঐ বংশের রাজার নাম ভারত রায় এই ভারত রাজার বংশে যুধিষ্ঠির এবং যুধিষ্ঠির রাজার চারি সহস্র বৎসর পরে পৃথ্বিরায় জন্মগ্রহণ করেন। আর ভারত রায়ের নামানুসারে এই দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া খ্যাত হয়

আজ্‌মীর ও দিল্লী।

মহারাজ সূর্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পঁয়ত্রিশ জন সন্তানের মধ্যে কেবল মাত্র কাযকোবাদ হিংদুস্থানেব রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্য শাসনে নিজেকে অনুপযুক্ত ভাবিয়া, এক উপায় আবিষ্কার করিলেন তাঁহার এক অনূঢ়া দুহিতা ছিল, তিনি সেই দুহিতা রত্নকে জগৎ বিজয়ী বীর রোস্তমের করে সমর্পণ করেন, এবং বীর জামতার সাহায্যে কিছু দিন রাজ্য শাসন কবিতে থাকেন। ঐ সময়ে চৌহানবংশের রাজা আজয় পাল আজ্‌মীর যাইয়া পর্ব্বতের নিম্নদেশের বন-জঙ্গল কাটাইয়া জনপদ স্থাপন করেন, এবং নিজের ও পর্ব্বতের নামানুসারে সেই জনপদের নাম আজ্‌মীর রাখেন। সংস্কৃত ভাষায় পাহাড়কে মীর বলে নিজের নামের প্রথমার্দ্ধ 'আজ' ও পর্ব্বতের নাম 'মীর' এই উভয় শব্দ একত্র করিয়া তিনি "আজ্‌মীর" রাখিলেন রাজা আজয় পালের চব্বিশটী পুত্র সন্তান ছিল, রাজকুমারগণ সকলেই যথা সম্ভব যত্ন চেষ্টা করিযা আজ্‌মীরকে নগরে পরিণত ও তাহাব সৌষ্টব সাধন করেন

পাঠকগণ! বোধ হয় এত শীঘ্র রাজা কায়কোবাদের কথা বিস্মরণ হযেন নাই। কাযকোবাদ পবলোক গমন

করিলে তদীয় পুত্র বাহরাজ রায় মহারাজ উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। তিনি বাহুবলে পার্শ্বস্থ বহু স্থান অধিকার করেন তাঁহার বিজয় পতাকা বারাণসীধাম পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হয় এবং তিনি সেখানে বিশ্বেশ্বর নামক দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কবাইয়া, মূর্ত্তি পূজক হিন্দুধর্ম্মের মহত্ব প্রচার করেন। ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পবলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কেদার রায় হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র উনিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে শঙ্গল রায় রাজা হয়েন। তিনি বিপুল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চৌষট্টি বৎসর রাজ্য শাসন করিবার পর মহাবীর রোস্তমের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র বরহুত্ রায় রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত রাজ্য চালাইয়া ছিলেন। তিনি একাশি বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তাঁহার পরলোক গমনের পর কেদার চন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। তিনি তেতাল্লিশ বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পর, তদীয় সেনাপতি জয়চন্দ্র রাজাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি নির্ম্মম প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই নানা কারণে প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইযা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতা দিলু রায়কে রাজা করে

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভারতে মোস্‌লেম পদার্পণ।

রাজা দিলুরায় যেমন বুদ্ধিমান তেমনই বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি উর্ব্বর ভূমিখণ্ড আবাদ করিয়া, নিজের নামানুসারে তাহার "দিল্লী" নাম প্রদান করেন এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া পরমানন্দে রাজত্ব করিতে থাকেন তাঁহার রাজত্ব কালে বিখ্যাত "বনী উম্মিয়া" বংশের অলিদ বিন্ আবদোল মোল্‌ক আরব দেশের বাদসা ছিলেন। তাঁহার শাহী দরবারে রৌসন আলী নামক এক দরবেশ ছিলেন, তাঁহার মনে ভারতবর্ষ দেখিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মায় তিনি ভ্রমণছলে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। একদিন দিলু রাজা আহার কার্য্যে পরিব্যস্ত ছিলেন; দরবেশ রৌসন আলী হঠাৎ তথায় যাইয়া অতর্কিত ভাবে রাজাকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে দিলুরায় অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া স্বীয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, এই অস্পৃশ্য মুসলমানের হাত কাটিয়া দাও সে আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল রাজার এই দুর্ব্যবহারে; ফকির বলিতে লাগিলেন,—

"ওরে নরাধম, বিধর্ম্মি, অত্যাচারী রাজা! তোর এই নৃশংস ব্যবহারের প্রতিফল অচিরেই প্রাপ্ত হইবি! তুই কি জানিস না সয়তান! মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করিয়া জগতে কেহ কোন দিন নিস্তার পায় নাই"

এই বলিয়া রৌসন আলী প্রস্থান করিল। তিনি অত্যল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাদ্‌সা অলিদের দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদ্‌সা নামদার প্রিয় বয়স্যের ছিন্ন হস্ত দেখিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন এবং এরূপ হইবার কারণ কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রৌসন আলী রাজা দিলুরায়ের মুসলমান বিদ্বেষ ও তাঁহার অত্যাচার কাহিনী যথাযথ ভাবে বিবৃত করিলেন বাদ্‌সা অলিদ তাহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দিলুরায়কে শিক্ষা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ এক পরাক্রান্ত সৈন্যদল হিন্দুস্থানে প্রেরণ করিলেন। সে মোস্‌লেম বাহিনী ঝড় বেগে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দিলুরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল মুসলমান সৈন্যবৃন্দের দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে হিন্দু সৈন্যগণ ঝড়মুখে শুষ্ক পত্রবৎ মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল দিলুরায় কিছুক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শেষে নিহত হইয়া সমর ক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা কোথায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। মোস্‌লেম সৈন্য স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আবার হিন্দু রাজগণ দিল্লী রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন

৩৬৭ হিজরীতে নাসিরুদ্দীন সবুক্তগিন গজনী হইতে যাইয়া লাহোর, মুলতান, কাশ্মীর, ও আজমীর জয় করেন। তিনি তাঁহার বিজয় বাহিনী তারাগড়ের পর্ব্বত উপরে রাখিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে চৌহান বংশীয়

হর্ষরাজ মুসলমান সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং আজমীর দখল করিয়া লইয়া বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর রাজত্বের পর তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার পর একটী একটী করিয়া বহু রাজা আজমীরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। যখন বিশল দেব আজমীরের রত্ন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন সোলতান মাহমুদ গজনী ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করণোদ্দেশে হিন্দুস্থানে অভিযান করেন তিনি সতরবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ আক্রমণ করেন তাঁহার প্রতি অভিযানেই সফলতা লাভ হয় তিনি ৪০১ চারি শত এক হিজরীর অভিযানে আজমীর আক্রমণ করেন রাজা বিশল দেব তাঁহার দুর্দ্দান্ত সৈন্য বৃন্দ লইয়া মহা পরাক্রমে তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন, উভয় পক্ষ বিপুল দক্ষতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সাত দিন তুমুল ভাবে যুদ্ধ চলিল তথাপি কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ হইল না। শেষে অষ্টম দিনে গজনীপতি মাহ্‌মুদ নিজে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সেদিন মোস্‌লেম সৈনিকবৃন্দ এমন বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল যে, হিন্দু সৈন্যগণ কোন ক্রমে রণভূমে তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহারা প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। বিজয় গৌরবে মুসলমান সৈন্যবৃন্দ, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল আজ্‌মীর অধিপতি বিশল দেব প্রাণ ভয়ে তারাগড়ের পাহাড়ে পলাইতে ছিলেন; মুসলমান সৈন্যবৃন্দ তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করিল যুদ্ধ অবসান হইল।

পরদিন প্রাতে মহাবীর মাহমুদ, আজমীর রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বন্দী বিশল দেবকে তলব করিলেন। রক্ষীগণ বিশল দেবকে ঘিরিয়া লইয়া দরবারে উপস্থিত করিল তাঁহাকে দেখিযা গজনী সোলতান গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—

"মহারাজ। এখন আপনার অভিপ্রায় কি? আপনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আসিযা ধন মান, ও রাজ্য রক্ষা করিবেন? না ভ্রান্ত ধর্ম্মের অন্ধকার সঙ্গে লইয়া ঐ শোণিত পিপাসু তরবারি মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন? যা আপনার ইচ্ছা শীঘ্র ব্যক্ত করুন।"

বিশল দেব, কল্পনা করিতে পারে নাই যে আবার রাজ্য ফিরিয়া পাইব। সোলতান রাজ্য ফেরতের কথা বলিলে তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন আশ্চর্য্য ত হইবারই কথা; কত প্রাণ হানি, কত রক্তপাত, কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি যে রাজ্য জয় করিয়াছেন, শুধু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সে রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন; ইহা কি সম্ভবপর? বিশল দেব, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না সোলতানকে বলিলেন,—

"সোলতান! আমি যদি ইস্‌লাম গ্রহণ করি, তাহা হইলে কি আমি আমার অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইব?"

সোলতান ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"ইতিপূর্ব্বে ত আমি তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছি। আপনি ইস্‌লাম গ্রহণ করুন, আমি এখনই আপনাকে সিংহাসনে বসাইয়া আজমীরের মহারাজ বলিয়া সম্ভাষণ করিব।"

বিশল দেব পরমানন্দে সেই দণ্ডে ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুধা-স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সোলতান তাঁহাকে তখনই সিংহাসন প্রদান করিতে গেলেন। কিন্তু বিশল দেব তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—

"সোলতান. তুচ্ছ সিংহাসন আর আমার আবশ্যক নাই। আপনি যে রত্ন দিয়াছেন তাহাই আমার যথেষ্ট পার্থিব ধনসম্পত্তি আর আমাকে অন্ধ করিতে পারিবে না। আমার অবশিষ্ট জীবন ইস্‌লাম ধর্ম্মের সেবায় নির্জ্জনে অতিবাহিত করিব আপনি আমার গুরু, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা কবিতে সমর্থ হই"

যখন বিশল দেব একান্তই সিংহাসন গ্রহণ করিলেন না এবং নির্জ্জন বনে যাইয়া "খোদাতালার ধ্যানে" নিরত হইলেন। তখন সোলতান মাহমুদ, তাঁহার সৈন্যদলের সালারাশাহ নামক একজন সেনানীকে আজ্‌মীরের সিংহাসনে বসাইয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

সোলতান মাহমুদ সতর বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিবারেই বহু ধন, রত্ন, ও দাসদাসী লইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৪১৫ হিজরীতে শেষের অভিযানে গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথাকার বিখ্যাত শিব মন্দির 'সোমনাথ' বিধ্বস্ত করিয়া রাশিকৃত অর্থ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে সে সমস্ত ধন রত্ন দেশে লইয়া যাইতে তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল (১)

(১) সোমনাথ বিজয় দেখুন —লেখক।

সুমিস্ স্বাস্থ্য।

সালারা শাহ আজ্‌মীবের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিস্তৃতি সাধনে বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই চৌহান বংশীয রাজপুত সর্দ্দারগণ সর্ব্বদা তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ-বিফল করিয়া দিত এবং তাহারা সকল সময়ই মুসনমানগণের উপর খড়গ হস্ত হইয়া থাকিত। চারি শত চারি হিজবীতে বৃদ্ধ সালারা শাহ রাজকার্য্যে অশক্ত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মস্‌উদ গাজীর হস্তে শাসন দণ্ড পরিচালন ভার ন্যস্ত করেন। যুবক মস্‌উদ বিপুল বিক্রমে ও বেশ শৃঙ্খলতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি 'মস্‌উদাবাদ' নাম দিয়া একটী ক্ষুদ্র নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মস্‌উদাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু দিন পরে সালারা শাহ ইহধাম ত্যাগ করেন তাঁহার মৃত্যুর পরে চৌহান সর্দ্দারগণ আজমীর উদ্ধারের জন্য বিশেষ যত্নবান হয় তাহারা সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ পুষ্ট করিয়া, মুসলমানদিগকে উপর্য্যপরি আক্রমণ করিতে থাকে গাজী মস্‌উদ তাহাদের আক্রমণ প্রতিবারেই ব্যর্থ করিয়া দেন শেষে চৌহান দলপতিগণ বিপুল যুদ্ধ সম্ভার ও অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় বার বার যুদ্ধ করিয়া সলমান সৈন্যের সংখ্যা

নিতান্ত হ্রাস হওয়ায় সে বার হিন্দুগণই যুদ্ধে জয়লাভ করে। বীরবর মসূউদ পরাজিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ণ করিলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত বীরের ন্যায় প্রাণ দান করিলেন। তিনি বিশ বৎসর কাল আজ্‌মীরের শাসনদণ্ড বিপুল পরাক্রমে সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন

চারি শত চব্বিশ হিজরীতে আবার হিন্দুরাজা আনা দেও আজ্‌মীরের রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি কয়েক বৎসর মধ্যে আজ্‌মীরে 'আনা সাগর' নামক এক সুবৃহৎ খাল খনন করাইয়া ছিলেন। তিনি গত হইয়া যাইবার পর পৃথ্বিরায়ের পিতা সুমিস রায় আজ্‌মীরের রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কালে জয়পাল, সারেঙ্গদেও ও আনন্দ দেও হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ঐ সময়ে দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পালের সহিত, কান্যকুব্জাধিপতির মহা সংঘর্ষ বাধে। সেই যুদ্ধে আজ্‌মীরাধিপতি সুমিস রায়, দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পালকে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রকাশ যে সুমিস রায়ের সাহায্যেই মহারাজ অনঙ্গ পাল সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া ছিলেন। সেই উপকারের প্রত্যুপকার মানসে দিল্লীশ্বর স্বীয় সুন্দরী কন্যা রুদ্রাকা বাইয়ের সঙ্গে সুমিস রায়ের শুভ বিবাহ প্রদান করেন রুদ্রাকার গর্ভে ও সুমিস রায়ের ঔরসে পৃথ্বিরায়ের জন্ম হয়। পৃথ্বিরায় ষোল বৎসর বয়ক্রম কালে দিল্লী সিংহাসনে বরিত হয় অল্প বয়সে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া পৃথ্বিরায় অতিমাত্রায় দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও উশৃঙ্খল হইয়া পড়েন। তিনি

আজ্মীর থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাঁড়া রায় দিল্লীর রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতেন পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে পৃথ্বিরাযের রাজ্য শাসন কাল, চারি হাজার আট বৎসর মাত্র এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দিল্লী ও আজ্মীবের শাসন কর্ত্তার সংখ্যা মোট এক শত কুড়ি জন।

সুমিস রায়ের ভবিষ্যৎবাণী।

পৃথ্বিরায়ের পিতা মহারাজ সুমিস রায় জ্যোতিষ বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি যোগ বলে অনেক বিষয় বলিতে পারিতেন তিনি মৃত্যুর সময়ে পুত্র পৃথ্বিরাযকে উপদেশ প্রদানার্থে বলিযা ছিলেন ঃ-

"বাবা পৃথ্বি! আমি আমার এই অন্তিম সময়ে তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহা তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে এবং তাহা প্রতি পালন কবিতে কখন বিরত হইও না। আমি যোগ বলে জানিতে পারিযাছি হিন্দুস্থানের কোন রাজাই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না তাহাদের হস্তে তোমার রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, কোন আশঙ্কা করিবে না। তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে যেন তোমার শাসনাধিকারে কোন মুসলমান ফকিরের অবমাননা না হয় যেহেতু আমি জানিতে পারিয়াছি তোমার রাজত্ব কালে এক মহা তেজস্বী মুসলমান সাধু-পুরুষ এদেশে আগমন করিবেন এবং সেই মহা-পুরুষ এদেশে সত্য সনাতন একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে থাকিবেন। তিনি ঐশী শক্তিবলে বহু অসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিবেন তাঁহার

নিকটে কাহার অস্ত্রবল, ভূজবল কার্য্যকরী হইবে না। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়া বহু লোক তাঁহার প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। আরও জানিতে পারিয়াছি, সেই সাধু-পুরুষ তোমার দুর্ব্যবহারের জন্য তোমাকে অভিসাপ দিবেন, তাহাতে তোমার সম্ভ্রম সম্পদ সমস্ত নষ্ট হইবে, এমন কি তোমার রাজ্য ও প্রাণ বিনষ্ট হইযা যাইবে। তজ্জন্য তোমাকে আবাব সাবধান করিতেছি, তুমি জ্ঞান ত কখনও মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীর অবমাননা করিও না যেন তোমার দ্বারা তাঁহার কোন অন্যায় না হয়। যদি তুমি সাধু পুরুষের কোন অবমাননা না কর, তবে তোমাব কোন আশঙ্কা নাই। বরং তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শনে তুষ্ট করিতে পারিলে তোমার সমূহ মঙ্গল হইবে ”

এই উপদেশবাণী প্রদান করিবার কিছুদিন পরে মহাবাজ সুমিস রায় ভবলীলা সম্বরণ কবিলেন রাজ্য মদ গর্ব্বিত পৃথ্বিরায তাঁহার পিতৃদেবের সে উপদেশ নিতান্ত অসার জ্ঞান করিলেন। সামান্য ফকির তাঁহার এরূপ অনিষ্ট করিবে ইহা তাঁহার বিশ্বাস আদৌ জন্মিল না। বরং সেই দিন হইতে তিনি মুসলমান ফকিরের প্রতি বিদ্রোহী হইযা তাঁহাদের রাজ্যের কোন স্থানে দেখিতে পাইলে ধরিয়া আনিবার জন্য, স্থানে স্থানে সৈন্যদল রাখিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের দিল্লী আগমন।

চল্লিশ জন অনুচর সমভিব্যাহারে খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) একদিন অপরাহ্নে দিল্লী নগরে উপস্থিত হয়েন। যে সময় তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, তখন আসরের নামাজের সময়। তিনি নামাজ সমাধার জন্য একজন সহচরকে আজান দিতে বলিলেন। সহচর তৎক্ষণাৎ আজান দিতে আরম্ভ করিলেন। উচ্চ আজান ধ্বনির মধুময় স্বরে গগন পবন মুখরিত হইতে লাগিল। হিন্দুগণ সে শব্দে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। খাজা সাহেবকে কষ্ট দিবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের উপদ্রব উৎপীড়ন সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন তাহারা খাজা সাহেবকে দমন করণাভিপ্রায়ে আজমীরের মহারাজ পৃথ্বিরায়ের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আপনার রাজ্যে মুসলমান প্রবেশ করিযাছে। পৃথ্বিরায় খাজা সাহেবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এবং খাজা সাহেবকে নিহত করিবার জন্য তখনই একজন গুপ্ত ঘাতককে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। ঘাতক যথা সম্ভব সত্বর আসিয়া খাজা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত

হইল এবং সালাম জানাইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। খাজা সাহেব দিব্য দৃষ্টির অধিকারী, সয়তানের সয়তানী বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে তাহাকে বলিলেন,—

"রে কপট কাফের! তোমার কপটতা আমার কাছে অজ্ঞাত নয়। আমাকে হত্যা করিবার জন্য তুমি বগলের মধ্যে ছুরি লুকাইয়া রাখিয়া মুখে আলাপ করিতেছ। আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমার এ কপটতার প্রতিফল প্রদান করিতেছি।"

দুষ্টমতি ঘাতক খাজা সাহেবের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া কাতর ভাবে খাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। খাজা সাহেব তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। সেই কপট হৃদয় ঘাতক তৎক্ষণাৎ খাজা সাহেবের নিকট মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কথিত আছে সেই ঘাতক ইস্‌লামের শান্তি-স্নিগ্ধ-ছায়ায় থাকিয়া জীবনে সাতাশ বার পবিত্র হজ ব্রত পালন করিযাছিলেন।

খাজা সাহেবের এই অলৌকিক শক্তির কথা দিন দিন দিকে দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল অল্পদিনের মধ্যেই অনেক দূরে ছড়াইয়া পড়িল এবং বহুলোক খাজা সাহেবকে দেখিবার জন্য দিল্লী নগরে আসিয়া তাঁহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি দিল্লীতে অধিক দিন রহিলেন না। শীঘ্রই আজ্‌মীর যাত্রা করিলেন।

খাজা সাহেবের আজ্‌মীর যাত্রা।

দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া খাজা সাহেব সহচর সমভিব্যাহারে আজ্‌মীর চলিলেন এ সংবাদ অচিরেই আজ্‌মীরাধিপতি মহারাজ পৃথ্বিরাযের কর্ণ গোচর হইল তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া মহা চিন্তাযুক্ত হইযা পড়িলেন এবং যাহাতে খাজা সাহেব আজ্‌মীরে উপস্থিত হইতে না পারেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, কৌশলে খাজা সাহেবকে আজ্‌মীর আগমন হইতে নিবৃত্ত করাই সঙ্গত এইরূপ সঙ্কল্প কবিযা তিনি কয়েকজন সুচতুর লোককে খাজা সাহেবের আজ্‌মীর আগমনে বাধা প্রদানের জন্য প্রেরণ করিলেন পৃথ্বিরায় প্রেরিত লোক সকল কয়েকদিন পথ পর্য্যাটন করিয়া খাজা সাহেবের সাক্ষাৎ পাইলেন তখন তিনি আজ্‌মীরের অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। লোক সকল খাজা সাহেবকে যথাবিধি সম্মান প্রদান করিয়া বিনয় বিনম্র মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,— "মহাত্মন! আমাদের ভক্তি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন আর আপনার পবিত্র পদে নিবেদন, এই যে, আপনার আর অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিয়া আজ্‌মীর যাইবার আবশ্যক নাই। আমরা আপনাকে চিনিয়াছি, আমরাই নিত্য আপনাকে আমাদের

হৃদয নিহিত ভক্তি-পুষ্প উপহার দিব। আর আপনার আস্তানার জন্য এমন এক সুন্দর স্থান দেখাইয়া দিব, যে স্থান সমগ্র রাজপুতনার মধ্যে উৎকৃষ্ট আপনি যদি আমাদের প্রার্থনা মত সেইস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশেব লেকেবই মহা উপকার হয়। তাহারা সকলেই সুবিধা মত আসিয়া আপনার পবিত্র চরণ দর্শন করিতে পারে আব আমরাও সকল সময়ই আপনার শ্রীচরণ সেবা করিয়া মহানন্দে কাল যাপন করিতে পারি।

কপটের বাক্যে নাহি ভুলে সাধু জন।
যে হৃদে রহমত সুধা বর্ষে অনুক্ষণ॥

খাজা সাহেব তাহাদের বাহ্যিক ভক্তি ও শিষ্টাচার দর্শনে বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন। কিন্তু সে সকল তাহাদের মৌখিক কি আন্তরিক সেই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল। তাহারা "বিষ কুম্ভ পয়ো মুখ" কি না জানিবার জন্য তখনই তিনি ধ্যানে (মোসাহেদা মোরাকেবায়) বসিলেন

তিনি ভক্তিময় চিত্তে একমনে কিছুক্ষণ ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকিবার পর হজরত রসুলে করিম (সঃ) কে দেখিতে পাইলেন। হজরত রসুলে করিম (সঃ) খাজা সাহেবকে যেন বলিলেন,—

"বৎস্য মঈনদ্দীন! তুমি কাফেরগণেব মৌখিক ভক্তি শ্রদ্ধা দর্শনে ভুলিও না তাহারা পৃথ্বিরায়ের গুপ্ত চর মধুর কথায় ভুলাইয়া তোমাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছে। প্রিয় বৎস্য তুমি সাবধান হও"

হজরতের উপদেশ বাণী শুনিয়া খাজা সাহেব ধ্যান হইতে উঠিলেন, এবং সমবেত কপটাচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

ওরে দুর্ম্মতি দল! তোরা কি আমাকে দিব্যদৃষ্টি বিহীন অন্ধ বিবেচনা করিয়াছিস? আমি কি তোদের শঠতা বুঝিতে পারিতেছি না? যা মূঢ়গণ! এখনই এ স্থান ত্যাগ কর। তোরা আমাকে কখনই ভুলাইতে পারিবি না এই বলিয়া তিনি আবার আজমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কপট লোকগণ যখন দেখিল তাহাদের সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হইযাছে, তখন তাঁহারা ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল।

সত্যের আশ্রয়ে যাঁর আত্মার গঠন!
কি করিতে পারে তাঁর শতেক দুর্জ্জন!!

নবম পরিচ্ছেদ।

আজমীরে খাজা সাহেব

দয়াময় আল্লাহ্‌তালা আজমীরকে গৌরবান্বিত ও পবিত্রময় করিবার জন্য, তাপস কুল-শ্রেষ্ঠ হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) কে এই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন খাজা সাহেব বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হজরত রসুলে করিম (সঃ) মের আদেশমত ৫৬১ পাঁচ শত একষট্টি হিজরীর ৭ই মহরম তারিখে আজমীর নগরে প্রবেশ করিলেন। যখন খাজা সাহেব নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া গিয়াছে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি মেদিনীবক্ষ ত্যাগ করিয়া তরুশিরে ঝিক্ মিক্ করিতেছে খাজা সাহেব চল্লিশ জন সহচরসহ একটী বৃক্ষমূলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। খাজা সাহেব যে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, তথায় উষ্ট্র রক্ষকেরা উষ্ট্র রক্ষা করিত খাজা সাহেবের উপবেশনের অল্পক্ষণ পরেই, একটি উষ্ট্ররক্ষক তথায় উপস্থিত হইল, এবং খাজা সাহেবকে বলিল,—"দাতাজী! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনি কি জানেন না এ রাজ্য রাজা পৃথ্বিরায়ের; যাঁহার বিক্রমে সমস্ত হিন্দুস্থান সন্ত্রাসিত।

যিনি মুসলমান ফকিরের নাম শুনিলে ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন সেই জন্য আপনাকে বলিতেছি, আপনি যদি আপনার মঙ্গল চাহেন, আপনার মহামুল্য প্রাণ যদি হারাইবার বাসনা না থাকে, তবে সত্বর এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে চলিয়া যান আপনি এখানে আসিয়াছেন তিনি যদি কোন প্রকারে এ কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার আর রক্ষা থাকিবে না। যে স্থানটীতে আপনি বসিয়াছেন ইহা তাঁহারই উষ্ট্র বাঁধিবার জায়গা অতএব আপনি আর কাল বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্রই এস্থান হইতে প্রস্থান করুন ”

খাজা সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন,—

“আচ্ছা তাহাই হইতেছে আমি উঠিয়া গেলেই যদি তুমি উষ্ট্র বাঁধিতে পার ; তবে আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি ”

এই বলিয়া তিনি, আনা সাগরের তীরস্থ একটী পাহাড়ের উপরিস্থিত বৃক্ষমূলে সহচরসহ যাইয়া উপবেশন করিলেন। অদ্যাবধি ঐ স্থান খাজা সাহেবের তপস্যা ভূমি বলিয়া খ্যাত আছে তীর্থভ্রমণকারীগণ ঐ স্থানে যাইয়া অদ্যাপি জিয়ারত করিয়া থাকেন।

খাজা সাহেব উঠিয়া গেলেন রক্ষক উষ্ট্রগুলি লইয়া যথা স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে পশু পালকগণ আসিয়া পশুগুলিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! কোন পশুই উঠিয়া দাঁড়াইতেছে

না রাত্রে যে যেমন ভাবে শুইয়াছিল ঠিক তেমনি ভাবেই রহিল রক্ষক বহু তাড়না, বহু প্রহার করিল কিন্তু একটী পশুও উঠিল না। বহু চেষ্টা করিয়া যখন কোন পশুকে তুলিতে পারিল না, তখন বুঝিল, নিশ্চয়ই ফকির কিছু না কিছু করিয়াছে, নতুবা পশুগুলি উঠিতে পারিতেছে না কেন? এইরূপ ভাবিয়া তাহারা মহারাজ পৃথ্বিরায়ের নিকট গমন কবিল এবং ফকিরের আগমন ও উষ্ট্রগুলির বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিল। পৃথ্বিরায় পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মুখে ফকিরেব আগমন ও তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে উষ্ট্ররক্ষকের কথায় খাজা সাহেবকে তাঁহার পিতৃদেব নির্দ্দেশিত ফকির মনে করিয়া যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি উষ্ট্ররক্ষক সারবানকে বলিলেন,—

"সারবান! তুমি ফকিরকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, তজ্জন্য ফকির ক্রোধান্বিত হইয়া অভিশাপ দেওয়ায় উষ্ট্রগুলির উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে সেই ফকিরের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত সেগুলির আরোগ্যের আশা নাই অতএব তুমি এক্ষণে সেই ফকিরের অনুসন্ধান করিয়া অনুনয় বিনয় বাক্যে তাহার সন্তুষ্ট সাধন করগে তিনি প্রসন্ন হইলেই উষ্ট্র-গুলি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে উহাতে আমি কিছুই করিতে পারিব না"

এই বলিয়া তিনি বিষণ্ন বদনে অন্তঃপুরে মাতার নিকট

গমন করিলেন তাঁহার জননী রুদ্রাকাবাই সন্তানের মলিন মুখচ্ছবি দেখিয়া উদ্বিগ্নাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—

"বাবা! পৃথ্বি তোমার কি হইয়াছে?

পৃথ্বিরায মাতৃসন্নিধানে ফকিরের আগমন ও ফকিরের আগমনে বাধা প্রদান, ও উষ্ট্রগুলির অবস্থা একে একে সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন তাহা শ্রবণ করিযা রুদ্রাকাবাই বলিলেন,—

"বৎস্য পৃথ্বি! ইহাতে চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। সাধু-সন্ন্যাসীগণ বিধাতার প্রিয পাত্র। তাঁহারা মহৎ, তাঁহাদের অন্তঃকরণ মহা পবিত্র। হিংসা, দ্বেষ লালসা, কুঅভিসন্ধি ও পর-স্ত্রী কাতরতা কখনও তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে পাপীর পাপ খণ্ডন, জীবের দুর্গতি মোচন প্রভৃতি জগতের হিত চিন্তাই করিয়া থাকেন। তুমি যদি তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার না কর, তবে তিনিও কখন তোমার প্রতি বিরূপ হইবেন না। অতএব তিনি যাহাতে তোমার প্রতি সদয় হন, তুমি সে চেষ্টা কর। তুমি সেবা, ভক্তির দ্বারা তাঁহার মনরঞ্জন করগে। তাহা হইলে তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই আর যদি তাহা না কর, যদি রাজপদ-মর্য্যাদা গর্ব্বে তাঁহার বিরক্তি, অসন্তোষ উৎপাদনে ব্রতী হও, তাহা হইলে তুমি মহা বিপদে পড়িবে। তোমার রক্ষা থাকিবে না।

মাতার বাক্য পুত্রের কর্ণে বিষবৎ বোধ হইল। পৃথ্বিরায় ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঘৃণা ব্যঞ্জক রোষ-রক্তিম মুখে বলিলেন,—

"জননি! আপনি কি আত্মজ্ঞান বিবর্জ্জিতা হইয়া পড়িয়াছেন নতুবা আজ আপনি এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলেন। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার উচ্চ মস্তক নত হইয়া পড়িতেছে। সামান্য ফকির, তাহাতে আবার মুসলমান, আমি রাজ–সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া তাহার সেবা করিব? ইহা অপেক্ষা ঘৃনিত কার্য্য আর কি হইতে পারে আমি তাহা কখনই করিতে পারিব না তাহার চেয়ে আমার মরণ মঙ্গল। এই বলিয়া পৃথ্বিরায ক্রোধ কম্পিত কলেবরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন

মৃত্যু যার শিরোদ্দেশে করিছে ভ্রমণ!
সে কি কভু শুনে ভাই হেকিম বচন!!

সারবান পৃথ্বিরায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া খাজা সাহেবের সন্নিধানে গমন করিল এবং তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"দাতাজী। আমরা অধম, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন! আপনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিলে, রাজ-রোষে পড়িয়া আমরা সকলেই মারা যাইব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের উষ্ট্র গুলির পূর্ব্ব অবস্থা প্রদান করুন। নচেৎ আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই"

খাজা সাহেব পশু রক্ষকদের বিনয় বিনম্র কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া পড়িলেন তিনি স্নেহ মাখা স্বরে বলিলেন,—

"যাও বৎস্যগণ! যাঁহার আজ্ঞায় উষ্ট্রগুলি উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছিল এক্ষণে তাঁহারি ইচ্ছাক্রমে সে গুলি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

খাজা সাহেবের মধুমাখা ভাষায় পশুগুলির পূর্ব্বাবস্থা লাভের কথা শুনিয়া রক্ষকগণ মহানন্দে নাচিতে নাচিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল ও অনতিবিলম্বে যে স্থানে পশুগুলি ছিল, তথায় যাইয়া দেখিল—উষ্ট্র সকল পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে এবং এদিক ওদিক বিচরণ করিয়া আহার করিতেছে। পশুরক্ষকগণ খাজা সাহেবের এই অদ্ভুদ শক্তি সন্দর্শন করিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্য ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণগণের অভিযোগ।

খাজা সাহেব আনা সাগরের তীরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সহচরগণ সহ বসবাস করিতে লাগিলেন। কথিত আছে ঐ আনা সাগরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দির ছিল ঐ সকল মন্দিরের প্রতিমা গুলির পূজা প্রদানের জন্য তিন শত পঞ্চাশ জন পূজারী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত মন্দির গুলির ব্যবহারের জন্য প্রত্যহ তিন মণ করিয়া তৈল ব্যয়িত হইত।

তদ্ব্যতীত মন্দিরের পূজার উপকরণ নৈবিদ্য প্রভৃতি যাহা কিছু লাগিত সমস্তই মহারাজ পৃথ্বিরায ব্যয ভূষণ করিতেন।

যাহা হউক খাজা সাহেব তথায় বসবাস করাতে মোস্‌লেম বিদ্বেষী পূজারী ব্রাহ্মণগণ মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল তাহা-দের সন্নিকটে মুসলমান ফকির সকল বাস করিবে, ইহা তাহাদের একেবারেই অসহ্য বোধ হইল তাহারা অবিলম্বে রাজার নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল,—

"মহারাজ! আপনার রাজ্যে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম বজায় রাখিয়া বাস করা যাইবে না আনা সাগরের মন্দির গুলিতে আর আমরা পূজা-অর্চ্চা করিতে পারিব না"

ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ পৃথ্বিরায় যার-পর-নাই বিস্ময় সহকারে বলিলেন,—

"দ্বিজগণ! কি কারণে আজ আপনারা এরূপ কথা বলিতেছেন, আনা সাগরের তীরবর্ত্তী মন্দিরে কি হইয়াছে?"

ব্রাহ্মণগণ বলিল,—

"মহা অনর্থ সংঘটন হইয়াছে মহারাজ! কোথা হইতে একদল মুসলমান ফকির তথায় আসিয়াছে। তাহারা আমাদের মন্দিরের পুরোভাগে আশ্রম নির্ম্মাণ করিযা বসবাস করিতেছে। বড় দুর্জ্জয় ফকিব মহারাজ! আমাদের কোন কথাই তাহারা গ্রাহ্য করে না। তাহারা দিন রাত আল্লা আল্লা রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছে। আর মহারাজ. সকাল সন্ধ্যায় যখন আমরা সন্ধ্যা-আহ্নিক করি, তখন তাহারা "আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর" করিয়া চতুর্দ্দিক শব্দায়মান করিয়া তুলে, তাহাতে আমরা পূজার মন্ত্রাদি সমস্ত ভুলিয়া যাই। তজ্জন্য আপনার নিকট জানাইতেছি যে, যতদিন তাহারা তথায় থাকিবে ততদিন আমরা পূজা-অর্চ্চা কিছুই করিতে পারিব না।"

দ্বিজগণের কথা শুনিয়া পৃথ্বিরায় ক্রোধে অনল শিখার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"কি আমার রাজ্যে মুসলমান ফকিরের আজান ধ্বনি! আমি জীবিত থাকিতে আনা সাগরের মন্দিরে পূজা বন্ধ! তাহা কখনও হইবে না। সৈন্যগণ! তোমরা এই দণ্ডে যাও। আনা সাগরের তীর হইতে সেই সব দুর্জ্জন ফকিরদের অবিলম্বে

বিতাড়িত করিয়া দাও। আর তাহাদের এমন ভাবে শিক্ষা দিবে, যেন পুনরায় তাহারা আমার রাজ্যের কোথাও আর আজান উচ্চারণ না করে

রাজ আদেশে সৈন্যগণ ঝড়বেগে প্রস্থান করিল। অনতি-বিলম্বে খাজা সাহেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রোষ-রক্ত মুখে মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"তোমরা কি জীবনের ভয় রাখ না? এই আজমীর নগরে কোন সাহসে তোমরা আজান উচ্চারণ করিতেছ? যাহা হউক তোমরা যদি জীবনের মমতা রাখ, তবে এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ কর অন্যথায় আমরা তোমাদের বধ করিতে কুণ্ঠিত হইব না"

সৈন্যগণের অভদ্রজনোচিত বাক্যে খাজা সাহেব হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাথা বোধ করিলেন, এবং নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন,—

"রে দুর্বিনীত সৈন্যবৃন্দ! আমরা তোদের ভয়ে কিছুমাত্র ভীত নহি এবং এস্থান হইতে আমরা কোথাও যাইব না, তোরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে আর এক পদ অগ্রসর হস্, তাহা হইলে তোদের রক্ষা থাকিবে না।"

তাহারা খাজা সাহেবের নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিল না। যেমন তাহারা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইল, অমনি খাজা সাহেব এক মুষ্টি ধূলি লইয়া তাহাদের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ধূলিরাশি স্পর্শ মাত্রেই তাহাদের কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ বা পাগল হইয়া মহা চিৎকার করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এ সংবাদ যথা সময়ে পৃথ্বিরাযের কর্ণগোচর হইল তিনি মহা ক্রোধিত হইয়া মহন্ত রামদেও নামক এক বিখ্যাত সন্ন্যাসীকে ডাকাইলেন একজন প্রহরী অনতি বিলম্বে রাম দেওকে ডাকিযা আনিল। রামদেও মহারাজকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া বলিল,—

"মহারাজ! কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন?"

পৃথ্বিরায় বলিলেন,—

"রামদেও! আমি মহা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়াছি কোথা হইতে একদল মুসলমান ফকির আসিয়া আমাকে মহা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে আনা সাগরেব দেব মন্দিরের সম্মুখে তাহারা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাতে মন্দিরের দেব পূজার বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহাদেব বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য, একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া ছিলাম। কিন্তু ফকির যোগিনী বিদ্যায় পারদর্শী মন্ত্রবলে আমার সৈন্য বৃন্দদের কাহাকে খঞ্জ, কাহাকে অন্ধ, কাহাকে উন্মাদ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তুমি আমার রাজ্য মধ্যে যোগিনী বিদ্যায় অদ্বিতীয় বহুদিন হইতে তুমি তন্ত্র-মন্ত্র বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়াছ তজ্জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকেই পাঠাইতেছি। তুমি আনা সাগরের তীরে যাইয়া সেই দুর্জ্জন ফকিরদের যত শীঘ্র পার আমার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। আমি আশাকরি তোমার নিকট সে ফকিরের কোন বাহাদুরী চলিবে না। তুমি এক্ষণে চলিযা যাও, কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলে বিশেষ পুরস্কার পাইবে।"

রামদেও রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া "জি আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সে তনতিবিলম্বে অনন সাগরের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল। এবং খাজা সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বলিল,—

"দাতাজী! আপনি কি মনে করিয়াছেন, কোন সাহসে আপনি রাজসৈন্যগণকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া তাহাদের বিতাড়িত করিলেন আমি এখনও আপনাকে বলিতেছি আপনার যদি কিছুমাত্র জীবনের প্রতি মমতা থাকে, তবে এই দণ্ডে এ স্থান ত্যাগ করুন আমি কে আপনি জানেন? মানুষ ত দূরের কথা, বনের বাঘ-ভাল্লুকও আমার নাম শুনিলে ত্রাসে প্রকম্পিত হয়।"

খাজা সাহেব সে কথায় ভাল করিয়া কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মুসলমান ফকিরের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য কেবল মাত্র রামদেওযের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন সে কি দৃষ্টি! সে দৃষ্টি যে লোকের বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে মহন্ত রামদেও সে দৃষ্টির দিপ্ত ঝলক সহ্য করিতে পারিল না। সে কাপিতে কাপিতে লুণ্ঠিত হইযা ভূতলে পড়িয়া গেল এবং সে এক দিব্য জ্ঞানলাভ করিল। তাহাতে জানিতে পারিল, প্রতিমা পূজা নিতান্ত অন্যায়। তপ জপ আরাধনা-উপাসনা সমস্ত মিথ্যা, ইসলামই জগতের মধ্যে একমাত্র সত্যধর্ম্ম।

এইরূপ জ্ঞান লাভ করিযা রামদেও তখনই খাজা সাহেবের নিকট মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল সত্যধর্ম্মের পুণ্যোজ্জ্বল

আলোকে তাহার হৃদয়তল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল রামদেবের সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহারাও সনাতন ইসলাম-ধর্ম্ম-তরুর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লইল খাজা সাহেব সকলেরই মুসলমানী নাম প্রদান করিলেন মহন্ত রামদেওয়ের নাম হইল সাদী। তাহারা একান্ত মনে ইমান আনিয়াছিল সেই জন্য তাহারা অত্যল্প দিনের মধ্যেই জনে জনে ওলীআল্লা হইয়া পড়িয়াছিল

দশম পরিচ্ছেদ।

পানীয় বিহীন আজমীর।

একদা খাজা সাহেবের একজন অনুচর এক পুষ্করিণীর পানীতে ওজু করিতে ছিলেন। নিকটস্থ হিন্দু অধিবাসীগণ তাঁহাকে কোনক্রমে ওজু করিতে দিল না অধিকন্তু সে স্থান হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল সে ব্যক্তি ক্ষুন্ন মনে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাজা সাহেবকে বলিলেন,—

"হুজুর! আজ আমি এক পুষ্করিণীতে অজু করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু হিন্দুগণ আমাকে কোনরূপে ওজু সমাধা করিতে দেয় নাই, তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে আপনি ইহার যাহা হয় উপায় করিবেন"

শিষ্যের কথা শেষ হইলে, খাজা সাহেব সাদী নামক তাঁহার একজন অনুচরকে বলিলেন;—"বৎস্য সাদী! তুমি আমার এই পাত্রটী পূর্ণ করিবা আনা সাগর হইতে পানী আনয়ন কর"

সাদী সম্ভ্রমভরে পাত্রটী লইয়া আনা সাগরে গেল। কি আশ্চর্য্য! সাদী পাত্রটী আনা সাগরের পানীর মধ্যে ডুবাইয়া ধরিতেই সাগরের সমস্ত পানী মুহূর্ত্ত মধ্যে পাত্রটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল অথচ সে আশ্চর্য্য পাত্র পরিপূর্ণ হইল না। শুধু আনা সাগর কেন? আজমীরের যেখানে যত কুয়া ও

পুষ্করিণী ছিল তাহার সমস্ত পানী শুকাইয়া গেল। এমন কি স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য দুগ্ধও সহসা বিলীন হইয়া গেল কি অদ্ভুদ ব্যপার! কি অলৌকিক কাণ্ড। সারা আজ্‌মীরে পানী বলিয়া কিছু রহিল না অথচ পাত্রটী পানীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল না সাদী অপরিপূর্ণ পাত্রটী খাজা সাহেবের নিকট লইয়া আসিলেন তখন আজমীর সহরে পানীর জন্য হাহাকার পড়িয়াছে। পানী পানী করিয়া সকলে মাতম আরম্ভ করিয়াছে এ কি সর্ব্বনাশ! সহসা এরূপ হইল কেন? কেহ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না শেষে সকলে অনুমানে বুঝিল, ফকিরের সঙ্গে রাজার বিবাদ চলিতেছে, সেই জন্য নিশ্চয় ফকির এই অঘটন ঘটাইয়াছে অন্যথায় কাহার সাধ্য এরূপ করিতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা রাজার প্রতি রাশি রাশি অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খাজা সাহেবের নিকট গমন করিতে লাগিল

রাজার পাপেতে রাজ্য হয় ছারখার।
সুখ নাহি থাকে প্রাণে রাজ্যের প্রজার

দলে দলে আসিয়া খাজা সাহেবের নিকট বহুলোক জড় হইল। তাহারা সকলে খাজা সাহেবের সম্মুখীন হইয়া ক্রন্দন বিমিশ্রিত কাতর স্বরে বলিতে লাগিল,—

"হে তাপস শ্রেষ্ঠ! হে মহা মনীষি! আমরা অধম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার শ্রীচরণে জ্ঞানত কোন অপরাধ করি নাই। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কেহ করিয়া

থাকে, তবে একের অপরাধে আমরা আজ্‌মীরবাসী সকলেই কি শাস্তি ভোগ করিব? ঋষিবর একবার করুণ নয়নে চাহিয়া দেখুন, সমগ্র আজ্‌মীরে আজ একবিন্দু জল নাই। কেবল জল কেন? জননী বক্ষে দুগ্ধাভাবও ঘটিযাছে। মাতৃস্তন্য-দুগ্ধ না পাইয়া শিশু সকল মৃত প্রায় হইয়া পড়িযাছে বালকগণ পিপাসায় কাতর হইয়া ওষ্ঠাগত প্রাণে ছট্‌পট্‌ করিতেছে। যুবক গণ তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া হায় হায় করিতেছে। সকল স্থানেই রোদন, সকল স্থানেই হাহাকার পড়িযাছে। আপনি রক্ষা না করিলে, আমাদের আর রক্ষার উপায় নাই। জলাভাবে সকলেই মারা পড়িব। করুণাময় আপনি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জলদানে আমাদের জীবনদান করুন"

এই বলিয়া তাহারা খাজা সাহেবের চরণ তলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িযা ক্রন্দন করিতে লাগিল দয়ার আদর্শ মূর্ত্তি খাজা সাহেব তাহাদের সেই করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না তাহাদের অবস্থা দেখিযা তাঁহার স্নেহ-কোমল হৃদয় বিগলিত হইল তিনি সান্ত্বনা প্রকাশক মধুর স্বরে বলিলেন,—

"যাও বৎসগণ! সকল স্থানেই পূর্ব্বের ন্যায় পানী প্রাপ্ত হইবে।"

তৎপর তিনি তাঁহার এক শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"বৎস আব্‌দুল্লা! তুমি ঐ পাত্রস্থিত সমুদয় পানী আনা সাগরে ঢালিযা দিয়া আইস।"

আবদুল্লা তৎক্ষণাৎ খাজা সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিল পাত্রের পানী আনা সাগরে ঢালিয়া দিতেই, আনা সাগর ও সহরের সমুদয় কূপ ও পুষ্করিণী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। খাজা সাহেবের এই অলৌকিক শক্তি, এই অসাধারণ কার্য্য-কলাপ সন্দর্শন করিয়া আজমীরবাসিগণ যার-পর-নাই বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া পড়িল সকলের হৃদয়েই অল্প বিস্তর খাজা সাহেবের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিল এবং অনেক লোক খাজা সাহেবের নিকট আসিয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মের অসারতা বোধ করিয়া অনেক দেব মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সেইস্থানে মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়া নামাজ পাঠের সুবন্দোবস্ত করিল রাজা পৃথ্বিরায় এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মহাবিচলিত হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ও ইস্লামধর্ম্মের ক্রমোন্নতি, তাঁহার চক্ষে সহ্য হইল না। কি উপায়ে খাজা সাহেবকে তাড়াইবেন এবং এইসব নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের উচ্ছেদ সাধন করিবেন তাহারই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন

পৃথ্বিরায়ের পরামর্শ সভা।

অচিরে রাজা পৃথ্বিরায় একটী পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন সে সভা পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী ও সভাসদবর্গে পূর্ণ হইল। রাজা সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে খাজা সাহেবের আগমন, তাঁহার প্রভাব বিস্তার ও তাঁহার দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন,—

"হে সভ্য মণ্ডলি! আমি ঐ দুর্জ্জয় ফকিরের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি এরূপ তেজস্বী ফকির এ রাজ্যে অধিক দিন অবস্থান করিলে সমগ্র আজমীর অধিবাসী যে অচিরেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ফকিরের অদ্ভুদ প্রভাবের কথা ভাবিয়া আমি রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। এখন কি উপায়ে ঐ ফকিরকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায়, হিন্দুধর্ম্মের মান-মর্য্যাদা যাহাতে বজায় থাকে, আপনারা সকলে মিলিয়া তাহার যথাবিহিত উপায় উদ্ভাবন করুন

রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই নীরব। ফকিরের প্রভাব সকলেই দেখিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সকলকে নীরব দেখিয়া রাজপণ্ডিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—

"মহারাজ! ফকির মহা তেজস্বী তাঁহার নিকট অর্থবল অস্ত্রবল বোধ হয় কিছুই কার্য্যকরী হইবে না। তিনি যেমন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বলীয়ান, তাঁহাকে পরাস্ত করিতে হইলে তদপেক্ষা পারদর্শী ঐন্দ্রজালিকের আবশ্যক সেইজন্য জানাইতেছি যে, আপনার রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐন্দ্রজালিক আজয় পাল। তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে ফকিরকে বিতাড়িত করিতে পারেন, অন্যথায় তাঁহাকে তাড়ান অপর কাহার সাধ্য নয়।"

সমবেত সভ্য মণ্ডলী বলিল,।—

"পণ্ডিত জী যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সঙ্গত কথা। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না যিনি একটী সামান্য পাত্রের মধ্যে সমগ্র সহরের জল আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহাকে পরাস্ত করা সহজ সাধ্য ব্যপার নহে"

পৃথ্বিরায় আশান্বিত হইয়া বলিলেন,—

"ভাল! তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হউক। কিন্তু আজয় পাল আসিবার পূর্ব্বে, আমি একবার সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিয়া দেখিব সে কত বড় তেজস্বী ফকির।"

রাজার বিরুদ্ধে কথা কহিবার ক্ষমতা কাহার নাই। কাজেই মন্ত্রিবর ঐন্দ্রজালিক আজয় পাল কে সংবাদ দিতে একজন লোককে পাঠাইয়া, রাজসৈন্যদলকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। তখনই মহা উৎসাহে সৈন্যবৃন্দ রণসাজে সুসজ্জিত হইল। রাজা পৃথ্বিরায়ও যুদ্ধবেশ পরিধান করিলেন, কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মহারাজ রণসাজ পরিয়া সৈন্যদলে আসিয়া যোগদান করিতে যেমন এক পদ অগ্রসর হইলেন অমনি তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন সহসা দুই চক্ষু অন্ধ হওয়ায় মহারাজ বুঝিতে পারিলেন, এই যুদ্ধযাত্রা নিতান্ত অশুভ এইরূপ বুঝিয়া যুদ্ধ গমনে বিরত হইয়া যেমন তিনি রণসাজ খুলিয়া ফেলিলেন, অমনি তাঁহার অন্ধত্ব সারিয়া গেল তিনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় সকল বস্তু দেখিতে পাইলেন পৃথ্বিরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিল, সৈন্য সজ্জিত রহিয়াছে যদি না যাওয়া হয় তাহা হইলে সকলেই আমাকে কাপুরুষ বিবেচনা করিবে এইরূপ ভাবিয়া আবার তিনি যুদ্ধবেশ পরিধান করিয়া যেমন অগ্রসর হইলেন তেমনি পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ হইয়া গেলেন আবার যুদ্ধ সংকল্প ত্যাগ করিতে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন আবার তিনি পূর্ব্ববৎ ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন, আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ হইলেন এইরূপ সাত বার অন্ধ হইবার পর তিনি নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ সংকল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেব ও আজয় পাল।

মন্ত্রি-প্রেরিত লোকটী যথ সময়ে আজয় পালের নিকট যাইযা উপস্থিত হইল আজয় পাল তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন,—

"কি জন্য মহারাজ আমাকে তলব করিয়াছেন তাহা তুমি কিছু অবগত আছ ?"

সংবাদ বাহক বলিল,—

আমি সবিশেষ অবগত না থাকিলেও তবে এইটুকু জানি যে, আনা সাগরের তীরে এক মহা তেজস্বী মুসলমান ফকির আসিয়াছেন তাঁহাকেই তাড়াইবার জন্য মহারাজ আপনাকে তলব করিয়াছেন ”

আজয়। ফকির কি করিয়াছেন, রাজা তাঁহাকে তাড়াই-বেন কি জন্য ?

সঃ বাঃ তিনি কাহাকে কিছু বলেন না, তবে তাঁহার প্রতি যাহারা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, কেবল তাহাদিগকেই তিনি কিছু শাস্তি দিয়া থাকেন। সম্প্রতি ফকিরের এক অনুচর একটী পুষ্করিণীতে যাইয়া অজু করিতেছিল কে একজন তাহাতে বাধা দিযাছিল সেইজন্য দাতাজি রাগ করিয়া সমস্ত আজমীরের পানীয় বন্ধ করিয়াছিলেন

কিরূপে জল বন্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপে সৈন্যদলকে অন্ধ, খঞ্জ, ও উন্মাদ করিয়াছিলেন, সংবাদ বাহক একে একে সমুদয় বৃত্তান্ত আজয় পালকে বলিল। আজয় পাল সমস্ত শুনিয়া বুঝিলেন যে, তিনি সামান্য ফকির নহেন। এরূপ শক্তিমান পুরুষের কাছে তাঁহার যাদুবিদ্যা কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহা হউক রাজ আহ্বান তিনি অবহেলা করিলেন না ; পরদিন প্রাতে তিনি আজমীর রাজ-সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন পাত্র মিত্র প্রভৃতি বহু সভাসদ পরিবেষ্টিত হইয়া, মহারাজ পৃথ্বিরায় উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে ছিলেন তিনি আজয পালকে দেখিয়া যথাবিহিত সম্মান প্রদানে বসিতে বলিলেন আজয় পাল আসন পরিগ্রহণ করিলে রাজা বলিলেন,—

"গুরুজী! আজ আমি বিষম বিপদে নিপতিত হইযাছি। আপনি ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। কোথা হইতে এক মুসলমান ফকির আসিয়া আনা সাগরের তীরে আস্তানা করিয়া বাস করিতেছে, তাহার জন্য ঐ সকল স্থানের দেবালয় গুলিতে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিয়াছে আপনি যদি দয়া করিয়া তাহাদের বিতাড়িত না করেন তবে আর রক্ষার উপায় নাই।"

আজয় পাল রাজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য বলিলেন,—

"মহারাজ! ইহার জন্য এত চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। আমি আজই সেই দুর্জ্জন ফকিরকে আনা সাগরের তীর হইতে

বিতাড়িত করিয়া দিতেছি মহারাজ! সে ত সামান্য ফকির, আমি কত শত বিরাট পর্ব্বতকে যাদুবিদ্যা দ্বারা তুলা রাশির ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহাকে বিতাড়িত না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না ”

এই বলিয়া আজয় পাল আনা সাগরের নিকটবর্ত্তী একটী ময়দানে যাইয়া তাঁহার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন

অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন খাজা সাহেবের তাহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি হস্তস্থিত যষ্টি সাহায্যে একটী রেখা টানিয়া, উহার মধ্যে আপনার অনুচরগণ সহ বসিয়া রহিলেন। ঐন্দ্রজালিক আজয় পাল প্রথমে শত শত অজাগর সর্প মন্ত্রবলে সৃষ্টি করিয়া খাজা সাহেবকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। মুহূর্ত্তে সেই সমস্ত মন্ত্রসৃষ্টির ভীষণ সর্পগুলি বিরাট ফণা ধরিয়া বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে খাজা সাহেবের দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা খাজা সাহেবেব অঙ্কিত রেখার মধ্যে কোন ক্রমে প্রবেশ করিতে পারিল না খাজা সাহেব সেই সমস্ত মায়া সর্প দর্শনে মৃদু হাস্য করিলেন, এবং মনে মনে কি এক 'এসম' পাঠ করিয়া সর্পগুলির দিকে ফুৎকার করিলেন অমনি মায় সর্পগুলি চক্ষের পলকে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। আজয পাল তাঁহার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিলেন এবারে আর সর্প নয় একেবারে অগ্নিবাণ বহু জ্বলন্ত অনলশিখা বিদ্যুত

গতিতে খাজা সাহেবের দিকে প্রধাবিত হইল কিন্তু সেগুলিও খাজা সাহেবের অঙ্কিত রেখার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না দ্বিতীয় বারের উত্তমও বিফল হইল তারপর. আজয় পাল তাঁহার আজন্মকাল শিক্ষায় যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন সে সমস্ত একে একে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে খাজা সাহেবের সামান্য মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হইযা গেল। শেষে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া একটী পনর মণ পরিমিত ওজনের এক খণ্ড প্রস্তব মায়া প্রভাবে খাজা সাহেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। খাজা সাহেব সহাস্যমুখে ঐ প্রস্তর খণ্ড তাঁহার উপর পতিত হইবার পূর্ব্বেই দুইটী অঙ্গুলীর সাহায্যে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহা ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। (১)

"মেরাতল এসরার" নামক ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, আজয় পাল যখন যথাসাধ্য তন্ত্র-মন্ত্র পরিচালনা করিয়া খাজা সাহেবের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই ফকির সাধারণ ব্যক্তি নহেন কোন সিদ্ধ পুরুষ এবং আধ্যাত্মিক বিত্যায় বিশেষ পারদর্শী। ইহার নিকট শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া তিনি খাজা সাহেবকে হাঁকিয়া বলিলেন,—

(১) অত্যাবধি ঐ প্রস্তর খণ্ড আজয় পালের গৃহের সন্নিকটে পথিপার্শ্বে পড়িয়া আছে।

"হে তাপস প্রবর! আমার বিদ্যা-বুদ্ধি এক্ষণে সমস্ত শেষ হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি অদ্বিতীয় সিদ্ধ পুরুষ এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যায় বিশেষ বুৎপন্ন। আপনি কৃপা পূর্ব্বক বলিয়া দিউন; হিন্দু ও ইস্‌লামধর্ম্মের মধ্যে কোনটী সত্য? কোনটী বিশ্বপাতার অভিপ্রেত?"

খাজা সাহেব বলিলেন,—

"এইমাত্র ত তাহার পরিচয় পাইলে আবার কি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ?"

আজয় পাল বলিলেন,—

"হে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞাতা মহাপুরুষ! আমি এই মাত্র জানিতে চাই, ভবিষ্যতে ভারতের শাসনরশ্মি হিন্দুর হস্তেই থাকিবে, না অন্য কোন জাতির করে ন্যস্ত হইবে?"

খাজা সাহেব বলিলেন,—

"বর্ত্তমানই যখন ভালরূপ বুঝিতে পার না, তখন ভবিষ্যৎ জানিয়া কি করিবে?"

আজয় পাল এ কথায় মনে করিলেন, তাঁহার ব্যবহারে নিশ্চয় খাজা সাহেব ক্রোধিত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবেন না কেন? আমার এখন পলায়ন ব্যতীত উপায় নাই। এইরূপ মনে করিয়া তিনি মন্ত্রবলে পক্ষীরূপ ধরিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া চলিলেন। খাজা সাহেব মোরাকেবায় থাকিয়া আজয় পালের বিষয় অবগত হইলেন তিনি দুষ্টের দমন কল্পে আপনার পদদ্বয়ের পাদুকা লইয়া নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—

"যাও বিনামা ! শীঘ্র ঐ দুর্ম্মতি ঐন্দ্রজালিককে প্রহার করিতে করিতে আমার নিকট লইয়া আইস "

খাজা সাহেবের আদেশে পাদুকা তখনই অদৃশ্য হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আজয় পালের মুখে ও মস্তকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া আসিল। আজয় পাল পাদুকা ঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া খাজা সাহেবের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্রন্দন বিমিশ্রিত কাতরস্বরে বলিলেন, –"মহাত্মন ! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে মার্জ্জনা করুন " তদুত্তরে খাজা সাহেব বলিলেন,—

"তুমি যদি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, নচেৎ তোমার পাপকার্য্যের জন্য ঐরূপ প্রহার ভোগ করিয়া তোমাকে মরিতে হইবে "

আজয় পাল বলিলেন,—

"আমি ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি একটু বিকাশ করিয়া দেখান, তাহা হইলে আমি আপনার দাস হইয়া আজীবন কাল শ্রীচরণ সেবায় নিযুক্ত থাকিব "

তাঁহার কথায় খাজা সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন তৎক্ষণাৎ মোরাকেবায় বসিয়া নিজের (রুহ) আত্মাকে পবিত্র আরসের দিকে চালনা করিলেন। আজয় পালও ধ্যানে বসিয়া তপস্যা বলে স্বীয় আত্মাকে খাজা সাহেবের আত্মার পশ্চাতে পশ্চাতে আকাশের দিকে পরিচালনা করিলেন যখন তাপস প্রবর খাজা সাহেবের

রুহ প্রথম আকাশে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন আজয় পালের আত্মা কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠিল। সে কোন ক্রমে আকাশে প্রবেশ করিতে পারিল না নিরুপায় হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শূন্যে ঘুরিতে লাগিল। অতঃপর আজয় পালের রুহকে খাজা সাহেব ফিরাইয়া আনিবার জন্য চক্ষু খুলিয়া মোরাকেবা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন

আজয় পাল খাজা সাহেবের অধ্যাত্মিক শক্তির অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া যার-পর-নাই স্তম্ভিত হইযা পড়িয়া ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মিয়া ছিল। সেইজন্য খাজা সাহেব বাহিরে আসিলেই তিনি তাঁহার নিকট সনাতন ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তখন মগরবের অক্ত হইয়াছিল। তিনি খাজা সাহেবের সঙ্গে মগরবের নামাজ পড়িয়া আবার মোরাকেবায় বসিলেন কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা মোরাকেবা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। খাজা সাহেব আজয় পালের নাম রাখিলেন আব্‌দুল্লা বিয়াবানী আজয় পাল মুসলমান হইয়া কোথাও গেলেন না; তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া খাজা সাহেবের খেদমত করিতে লাগিলেন

অবিলম্বে এ সংবাদ মহারাজ পৃথ্বিরায়ের কর্ণ গোচর হইল তিনি আজয় পালের মুসলমান হইবার কথা শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন এবং কিসে হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, কিসে ফকিরকে তাড়ান যাইবে, এই সমস্ত চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ফকিরের উপর তাঁহার যথেষ্ট ক্রোধ ও

হিংসা থাকিলেও তখন হইতে তিনি প্রকাশ্যে খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পাইতেন না তিনি মুখে মধু ও অন্তরে গরল ধারণ করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের অভিশাপ।

দিন দিন খাজা সাহেবের গুণ-গ্রাম ও প্রশংসা গীতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দূর দূরান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া প্রত্যহ খাজা সাহেবের পদপ্রান্তে আশ্রয় লইতে লাগিল। নব দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা প্রত্যহই হু হু শব্দে বাড়িয়া চলিল। রাজা পৃথ্বিরায় তাহা দেখিয়া শুনিয়া হিংসা ও দুঃখে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেন না। এইরূপে প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইয়া গেল। তারপর একদিন খাজা সাহেব মহারাজ পৃথ্বি-রায়কে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন সে আহ্বানে মদ গর্ব্বিত পৃথ্বিরায় ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং খাজা সাহেবের অনেক নিন্দাবাদ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—

"আপনি মুসলমান এবং সামান্য ফকির হইয়া আমাকে কোন সাহসে ধর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতেছেন, আপনি সাবধান হইয়া কথা বলিবেন, জানেন এ হিন্দুস্থান, এ দেশে চিরদিনই হিন্দুদিগের আধিপত্য প্রবল থাকিবে। এখানে কোন মুসলমান কোন বিধর্ম্মী আশ্রয় পাইবে না। আপনি পুনশ্চ এরূপ

অসংযত কথা বলিলে নিশ্চয় আমি আপনাকে বাঁধিয়া আনিয়া কারাগৃহে নিক্ষেপ করিব ”

এরূপ রূঢ় উত্তরে তাপস প্রবর খাজা সাহেব মহা দুঃখিত হইয়া আল্লাহতায়ালার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

“হে খোদাওন্দতালা! তুমি পাপিষ্ঠ পৃথ্বিরায়ের এই দর্প-অহঙ্কার চূর্ণ কর সারা হিন্দুস্থান মুসলমানের পদতলে লুণ্ঠিত করিয়া দাও। পৃথ্বিরায় মুসলমান হস্তে বন্দী হইয়া পশুর ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হউক। আর আজান ধ্বনিতে হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠুক।

করুণাময় আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয় ভক্ত আওলিয়াগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রায়ই বিমুখ হয়েন না। খাজা সাহেবের প্রার্থনা বিফল হয় নাই অচিরেই হিন্দুস্থান মুসলমান পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল

সেই সময় আফগানিস্থানের অন্তর্গত ঘোর প্রদেশে গিয়াসউদ্দীন ঘোরী তথাকার নরপতি ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সাহাবুদ্দীন ঘোরী বড়ই দোর্দ্দান্ত যোদ্ধা ছিলেন তিনি বহু দিবস হইতে হিন্দুস্থানে মোস্লেম পতাকা উড়াইবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন তাঁহার সে বাসনা প্রবল হওয়ায় একদিন তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন,—

“আমি একবার হিন্দুস্থান অভিযান করিব ”

সোলতান গিয়াসউদ্দীন ভ্রাতার উচ্চাশায় আনন্দিত

হইয়া বিশ হাজার সৈন্য-সম্ভারে তাঁহাকে হিন্দুস্থান বিজয়ে প্রেরণ করিলেন।

প্রসিদ্ধ "তারিখ ফেরেস্তা"র প্রথম খণ্ডের সাতাশি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। সোলতান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী ৫৮৭ হিজরীতে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেন। তিনি দিল্লী হইতে ৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং আজ্‌মীর হইতে সাত ক্রোশ অন্তরে নারায়ণ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

রাজা পৃথ্বিরায় তাঁহার এই অভিযান সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দুই লক্ষ তিন হাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া নারায়ণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন

অচিরে উভয়পক্ষ হইতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল সৈন্য বৃন্দের বীরদর্পে নারায়ণী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অস্ত্রের ঝন্ ঝন ও বীরবৃন্দেব হুহুঙ্কার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। হিন্দুসৈন্য অগণণীয প্রায়, মুসলমানযোদ্ধাগণ তাহাদের যত নিধন সাধন করিতে লাগিল ততই যেন তাহারা পুষ্ট হইয় উঠিতেছিল বীরকুলশ্রেষ্ঠ সাহাবুদ্দীন নিজের সৈন্যদল পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুসৈন্যের মধ্যস্থলে যথায় পৃথ্বি-রায়ের ভ্রাতা খাড়ারায় অবস্থান করিতেছিল, তিনি বীরদর্পে অশ্ব ছুটাইয়া তথায প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় যাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ বিক্রমে খাড়ারায়ের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিলেন।

ভীষণ বর্শা চক্ষের নিমিষে খাডারায়ের দন্তপাতি চুর্ণ করিয়া দিল। মুহূর্ত্তে হিন্দসৈন্যগণ হায় হায় করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে

বীরবর ঘোরীকে আক্রমণ করিল আহত খাড়ারায়ও ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায উত্তেজিত হইয়া সোলতানকে বর্ষাঘাত করিল ! সোলতান যদিও সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিলেন কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুসৈন্যবৃন্দের আক্রমণে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল ও একটী ভীষণ বর্ষা কোথা হইতে আসিযা তাঁহার দক্ষিণ বাহু মূলে বিদ্ধ হইল তিনি সে আঘাতে হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর বিপদ বুঝিতে পাবিল সে প্রচণ্ড পদাঘাতে মুহূর্ত্তে বহু শত্রুসৈন্য নিধন করিয়া পলায়ণের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল এবং প্রভুব আহত দেহ পৃষ্ঠে লইয়া বেগে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল সোলতানের অবর্ত্তমানেও মুসলমান সৈন্যের একটী প্রাণীও সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিল না সমস্ত দিন ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল সন্ধ্যা সমাগমে বিশ্রাম লাভ হেতু বণভেরী বাজিলে তাহারা প্রত্যাগমন করিল যখন সোলতানের অশ্ব রণভূমি ত্যাগ করে তখন কয়েকজন মোস্‌লেম সৈন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে তাহারা আহত সোলতানকে শিবিরে আনিযা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে সোলতানের আঘাত সাংঘাতিক ও হিন্দু সৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখিযা মুসলমান সৈন্যগণ পুনরায যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না তাহার তাবু তুলিয়া সেই রাত্রেই সোলতানকে লইযা স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নারায়ণী যুদ্ধে হিন্দুগণই বিজয় গৌরব মণ্ডিত হইল

আজমীর বিজয়।

সোলতান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী যথার্থই বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি কখন কোন যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই যদি নারায়ণী ক্ষেত্রে তিনি হতচৈতন্য না হইতেন তাহা হইলে তিনি কখনও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতেন না যখন তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন তাঁহাব সৈন্যগণ রণভূমি ত্যাগ করিযাছে, তখন ঘৃণা ও অপমানে তাঁহার মরিবার ইচ্ছা হইল তিনি সৈন্যগণকে বলিলেন,—

"কেন তোমরা! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে না? কোন মুখে তোমরা স্বদেশ যাইযা মুখ দেখাইবে? কেন তোমরা কাপুরুষের মত পলাইয়া আসিলে?"

সৈন্যগণ কোন উত্তর করিতে পারিল না, লজ্জায় সকলেরই মুখ নত হইযা পডিল যদিও তখন তিনি দেশে ফিরিযা গেলেন কিন্তু দারুণ অপমানে তিনি দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি অধিক দিন স্বদেশে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। এক বৎসর পরে আবার তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। গত বার অপেক্ষা এবার চারি গুণ অধিক সংখ্যক তাঁহার সৈন্যবল, রসদের পরিমাণও প্রচুর দৃশদ্বতীর তীরে তিনি শিবিবে থাকিয়া মহাবাজ পৃথ্বিরায়কে একখানি পত্র পাঠাইলেন পত্রের ভাবার্থ এইরূপ ছিল,—

"মহারাজ আজ্‌মীর ও দিল্লী অধিপতি! আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আবার আমি ভারত বিজয় হেতু আসিয়াছি, গত যুদ্ধে দৈবশক্তি নিবন্ধন আপনি রক্ষা পাইয়াছেন, এইবার আর আপনার নিস্তার নাই। আমি চতুর্গুণ সৈন্য লইয়া এবার আসিয়াছি যদি আপনার দিল্লী ও আজ্‌মীর সিংহাসন হারাইতে বাসনা না থাকে, যদি প্রাণের মমতা কিছুমাত্র রাখেন, তবে আফগানিস্থানের অধীনতা স্বীকার করিয়া পত্র বাহকের সঙ্গে হিন্দুস্থানের খাজানা আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিবেন। ইহার অবাধ্য হইলে হিন্দুস্থান হিন্দুর তপ্তরক্তে রঞ্জিত হইবে। আমি রেকাবে পা দিয়া রহিলাম। ইতি।

ভারত বিজয়াকাঙ্ক্ষী—

সোলতান মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন ঘোরী

গত বিজয় গৌরবে স্ফীত বক্ষ পৃথ্বিরায় সোলতানের পত্র পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনই তিনি সেনাপতি সংগ্রাম সিংহকে সৈন্য সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ যে সকল রাজা ছিল তাহাদেরও মুসলমান যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সে যুদ্ধে হিন্দুপক্ষের মোট সৈন্যসংখ্যা তিন লক্ষ হইল। পৃথ্বিরায সেই বিরাট বাহিনী লইয়া দৃশ্যদ্বতী তীরে উপস্থিত হইলেন তখন উভয়পক্ষ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুমুল যুদ্ধ, সে যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহুলোক নিহত হইতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হিন্দুসৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ

দিয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। মহারাজ পৃথ্বিরাযও পলাইতেছিলেন, কিন্তু খাজা সাহেবের অভিশাপ সে ত বিফল হইবার নয়। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তিনি মুসলমান সৈন্য হস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন। আরও অনেক হিন্দুসৈন্য ও সেনানী বন্দী হইয়াছিল। তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইলে অনেকেই মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সহচর্য্যে রহিল।

"ইয়াদগার দিল্লি"র মধ্যে লিখিত আছে, মহারাজ পৃথ্বিরায় ৪৯ উনপঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিযাছিলেন

যাহা হউক সোলতান সাহাবুদ্দীন ঘোরী দিল্লী জয় করিয়া আজমীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া প্রথমেই তাপসশ্রেষ্ঠ খাজা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন খাজা সাহেবের মনস্কামনা পূর্ণ হইল —ভারতে মুসলমান সম্রাটের অর্দ্ধ-চন্দ্রবিখচিত গৌরব পতাকা পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। সাহাবুদ্দীন ঘোরী অল্পদিন ভারতে থাকিয়া ভারতের শাসনভার কুতবদ্দীন আবেকের উপর নেস্ত করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধের পরে খাজা সাহেব কয়েকবার দিল্লীতে গমন করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে মুরিদ করিয়াছিলেন।

দিল্লী ও আজমীরে মুসলমান রাজ্য স্থাপন হইল। হিন্দুদিগের আর কোন উৎপীড়ন-উৎপাত রহিল না। খাজা সাহেবের শিষ্যমণ্ডলী নির্ভয় অন্তরে পথে ঘাটে ইসলামের মহত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন খাজা সাহেবের কেরামতের কথা আরও সুদূরে বিঘোষিত হইতে লাগিল হিন্দু-মুসলমান সকলেই খাজা

সাহেবের নিকট নত শির সকলেরই হৃদয় ভক্তি পূর্ণ ক্রমে আজ্‌মীর আর আজ্‌মীর রহিল না; আজ্‌মীর শরিফে পরিণত হইল।

খাজা সাহেব স্বীয় খানকায় বসিয়া অবিরত আল্লাহ তালার এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিতেন। কিন্তু যখন কোন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন খাজা সাহেব তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে অপ্যায়িত করিতেন এবং তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা অনুগ্রহ ভরে শুনিতেন ও তাহার সদুত্তর প্রদান করিতেন। জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের তিনি এমন সুন্দর ও সঙ্গত উত্তর প্রদান করিতেন যাহা শুনিয়া লোকের মনের বহুদিনের সঞ্চিত ভ্রম অন্ধকার মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত। যিনি খাজা সাহেবের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতেন তিনি জীবনে কখনও আর খাজা সাহেবকে ভুলিতে পরিতেন না খাজা সাহেবের খানকায় প্রত্যহই বহু দূর দূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। খাজা সাহেব সকলকেই সমচক্ষে দেখিতেন। সকলকেই ইস্‌লামধর্ম্মের মধুর উপদেশদানে পরিতুষ্ট করিতেন। তাঁহার উপদেশামৃত পানে লোক সকল এমনি ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া পড়িত যে, অনেকেই জীবনের সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া খাজা সাহেবের পদে দেহ-মন ঢালিয়া দিত। হিন্দুগণ হৃষ্ট মনে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। খাজা সাহেবের যে সকল কেরামত দেখিয়া লোক সকল বিমুগ্ধ হইত ও ইমান আনিত অতঃপর আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের কেরামত।

একদা খাজা সাহেব কোন একটী বনপ্রান্ত দিয়া কোথায় গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, বনের এক ধারে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে তিনি কৌতুহল নিবারণার্থে তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন অনেকগুলি লোক সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। খাজা সাহেব তাহাদের বলিলেন,—

"তোমরা এখানে অগ্নি জ্বালিয়া কি করিতেছ।"

তাহার বলিল,—

"আমরা পূজা করিতেছি।"

খাজা সাহেব পুনরুপি বলিলেন,—

"কি জন্য, কিসের পূজা করিতেছ?"

তাহারা বলিল,—

"অগ্নি আমাদের দেবতা, পরকালে নরকঅনল হইতে অব্যহতি পাইবাব আশায, আমরা সেই অগ্নি দেবতার পূজাই করিতেছি"

খাজা সাহেব। অগ্নি কাহার দেবতা হইতে পারে না। কারণ উহার নিজের কিছুই শক্তি নাই। তাহার পূজা করা

নিতান্ত অন্যায়, মহাপাপের কার্য্য। উহাতে সর্ব্ব-সৃজন-কর্ত্তা আল্লাহতালার অবমাননা করা হয়

তাহারা বলিল,—

"আপনাকে দেখিতেছি মুসলমানধর্ম্মের একজন ফকির আপনি ত আপনার আল্লার বিস্তর আরাধনা করিয়া থাকেন। এখন আপনি যদি ঐ জলন্ত আগুনের মধ্যে হাত দিয়া অক্ষত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আপনি নরকের অনল হইতে রক্ষা পাইবেন এবং আমরাও তাহা হইলে আনন্দিত মনে আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি"

খাজা সাহেব তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তোমরা কি বলিতেছ? আগুনের সাধ্য কি যে আমার হাত পোড়াইতে পারে। আল্লার হুকুমে ঐ আগুনে আমার একটী জুতা পোড়াইতেও সক্ষম হইবে না।"

এই বলিয়া তিনি পদ হইতে একটী পাদুকা উন্মোচন করিয়া সেই প্রজ্জ্বলিত অনল কুণ্ডে ফেলিয়া দিলেন। খোদা-তালার অনন্ত মহিমা! তৎক্ষণাৎ সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। যে স্থানে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাও স্বাভাবিক শীতল হইল খাজা সাহেবের এই অসামান্য কেরামত দর্শনে অনল পূজকগণ সেই মুহূর্ত্তে অগ্নিপূজা ত্যাগ করিয়া ভক্তিময় প্রাণে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তাহারা অচিরকাল মধ্যে জনে জনে তাপস শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিল

আর এক দিবস খাজা সাহেব তাঁহার খাদেম শেখ আলিকে সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া শেখ আলিকে ধাক্কা দিয়া ক্রোধ প্রকাশক অনেক কথা বলিতে লাগিল। খাজা সাহেব আগন্তুকের এই অভদ্র ব্যবহারে যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"কেন তুমি আমার এই খাদেমের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছ ?"

আগন্তুক বলিল,—

"এ লোক আমার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে, সে টাকা আমি কিছুতেই আদায় কবিতে পারিতেছি না। আজ আমি টাকা না পাইলে উহাকে ছাড়িয়া দিব না "

ইহা শুনিয়া খাজা সাহেব স্বীয় চাদরখানি মাটিতে রাখিয়া বলিলেন,—

"ঐ চাদরের ভিতর হইতে তোমার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ কর। সাবধান তাহার বেশী লইও না।"

সেই অর্থ লোলুপ আগন্তুক বিস্ময়ের সহিত চাদরের ভিতর হাত দিয়া দেখিল বিস্তর অর্থ তাহার মধ্যে স্তুপিকৃতভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। সে কোনক্রমে লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। প্রাপ্যের বহুগুণ বেশী অর্থে হস্তক্ষেপ করিল আর সে যাইবে কোথায় ? তাহার সমুদয় হস্তখানি মুহূর্ত্তে অবস হইয়া গেল এবং চাদরের ভিতর হইতে কোন প্রকারে হাত বাহির করিতে পারিল না। তখন সেই অর্থ গৃধ্রু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়ার অবতার খাজা সাহেব তাহার অবস্থা দেখিয়া

বিচলিত হইল আবার তাহার হাত পূর্ব্বের স্থায় করিয়া দিলেন।

এক সময় খাজা সাহেব আজ্‌মীর হইতে দিল্লী যাইতে ছিলেন; বনের ভিতর হইতে কতকগুলি দস্যু বাহির হইয়া সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এমন কি খাজা সাহেবের মস্তকে লাঠির আঘাত করিয়া বসে এমন সময় খাজা সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের পানে চাহিলেন। তাহারা সেই জ্বালাময়ী চাহনির দিপ্ত তেজ সহ্য করিতে পারিল না। সকলে ভয়ে অস্থির হইযা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল তাহাদের হাতের অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে পডিয়া গেল ভীষণ ব্যাঘ্রেব মুখে নিপতিত হইলেও বোধ হয় লোকে এত ভীত হয় না, তাহারা এই প্রকার হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা একটু প্রকৃতস্থ হইয়া খাজা সাহেবের পদপ্রান্তে লুন্ঠিত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। দয়ার্দ্র হৃদয় খাজা সাহেব, তাহাদের ক্ষমা করিলেন তাহাবা তাঁহার নিকট মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

একদা খাজা সাহেব আনা সাগরের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই পর্ব্বতে রাখালেরা গরু চরাইত। খাজা সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন,—একটী রাখাল একটী ছোট গো-বৎসকে বিস্তর প্রহার করিতে করিতে

তাড়াইয়া আনিতেছে করুণার্ণব খাজা সাহেবের চক্ষে তাহা সহ্য হইল না। তিনি তখনই রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"হে গোপাল! তুমি ঐ গো-বৎসটীকে অমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ কেন? এরূপ করিলে ইহার দুগ্ধ যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে"

রাখাল বিস্মিত ভাবে বলিল,—

"মহাশয়! আপনি কি বলিতেছেন? উহা যে বাছুর, মাত্র এক বৎসর উহার বয়স; উহার দুগ্ধ কোথা যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে?"

খাজা সাহেব। উহারই দুগ্ধ হইবে তুমি আমার পানের জন্য, একটু দোহন করিয়া দাও।

রাখাল অবাক হইয়া গেল। সে তবুও বলিল,—

"আপনি কি আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছেন? ঐ বাছুর গরুর কি কখন দুগ্ধ হওয়া সম্ভব যে আমি দোহন করিব?"

খাজা সাহেব। খুব সম্ভব; তুমি দোহন করিয়া দেখ, খোদার কুদরতে উহার বিস্তর দুগ্ধ হইবে পরে বাছুরটীকে বলিলেন,—

"গো বৎস! আমার পানের জন্য দুগ্ধ দাও

বাছুর মাথা নীচু করিল। তাহার দুগ্ধ হইবে এরূপ আশা রাখালের মনে আদৌ স্থান পাইল না। কেবল খাজা সাহেবের কথায় সে পাত্র লইয়া দোহন করিতে গেল। কি আশ্চর্য্য! যেরূপ দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধদান করে এ বাছুরও সেইরূপ দুগ্ধ প্রদান

করিতে লাগিল সে এত দুগ্ধ প্রদান করিল যে, চল্লিশটী লোকে আকণ্ঠ পান করিয়াও তাহা নিঃশেষ করিতে সক্ষম হইবে না।

খাজা সাহেবের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সেই রাখাল তখনই তাঁহার নিকট ইমান আনিল

খাজা সাহেবের কেরামতের কথা যখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার কাছে মুরিদ ও মুসলমান হইতে লাগিল এবং তাহাদের অনেকেই খাজা সাহেবের পদসেবা করিয়া ধন্য হইতে খাজা সাহেবের নিকট থাকিতে লাগিল তদ্ব্যতীত বহু অতিথি ও দীন-দুঃখী লোক খাজা সাহেবের বাবুর্চি খানায় খাইয়া প্রতিপালিত হইত বাবুর্চি এই অতিরিক্ত খরচের কথা খাজা সাহেবকে জানাইলে, খাজা সাহেব বলিলেন,—

"সাবধ ন! আমার মোসাফেরখানা হইতে যেন কোন লোক অভুক্ত অবস্থায় ফিরিযা না যায়। তোমার যত অর্থের আবশ্যক এইস্থান হইতে লইও।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার জায় নামাজের এক কোন তুলিয়া দেখাইলেন বস্তুতঃ বাবুর্চির যত অর্থের আবশ্যক হইত, সে সমস্ত অর্থ তথায় পাইত

যখন আজমীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইযাছিল যখন তাহারা মুসলমানধর্ম্মের রীতিনীতি পূর্ণ

মাত্রায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। রোজা, নামাজ, হজ ও জাকাত সকল পূণ্যানুষ্ঠান গুলির কোনটীও ত্যাগ করিত না, সেই সময় আজ্‌মীরবাসীগণ হজব্রত পালনের জন্য পবিত্র ভূমি মক্কাধামে যাইতে লাগিলেন। একদা হজের সময় বহু আজ্‌মীর বাসি হজ যাত্রা করিলেন। তাহাদের সঙ্গে খাজা সাহেব ছিলেন না। পথে কোনও স্থানে তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু তাঁহারা মক্কায় পৌঁছিয়া যখন পবিত্র কাবা শরিফ তওয়াফ করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন খাজা সাহেব প্রফুল্ল বদনে তওয়াফ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি কেমন করিযা আসিলেন। অতঃপর তাঁহারা হজ করিয়া আজ্‌মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, খাজা সাহেব হোজ্‌রার মধ্যে থাকিয়া আল্লাহ তালার এবাদত করিতেছেন আশ্চর্য্য এই তিনি কেমন করিয়া হজে গমন করিলেন এবং কি করিয়াই বা তথা হইতে ফিরিলেন

একদিন হজরত খাজা কুত্তবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট সামসুদ্দীন আলতামাসের সঙ্গে সখ্যতা ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময় এক গর্ভবতী নারী কোথা হইতে আসিয়া সম্রাটকে যথাবিহিত অভিবাদন করিযা বলিল,—

"জাহাপানা! বাঁদীর একটী আর্জ্জী আছে। মেহেরবানী পূর্ব্বক শুনিতে মর্জ্জী করিবেন"

বাদসা নামদার অভয় প্রদান করিলে সেই রমণী বলিল,—

"হুজর! আমি জ্ঞানহীনা রমণী, এক মহা গুণবান পুরুষ আমাকে অমৃতের লোভ দেখাইয় আমার হৃদয়ে গরল ঢালিয়া দিয়াছে। আমি এক্ষণে তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে চাই নচেৎ আমার ইজ্জত রক্ষা ও ভরণ পোষণের উপায় নাই। তাহার ঔরসজাত শিশু আমার উদরে বহিযাছে।"

সরলা রমণীকে ছলনায মুগ্ধ করিয়া কোন দুষ্ট লোক বোধ হয আত্ম গোপন করিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া সোলতান সামসুদ্দীন আলতামাস বলিলেন,—

"বল নারী. কে তোমার প্রতি এরূপ অন্যায় করিয়াছে"

রমণী নির্ভীক হৃদয়ে বলিল,—

"হুজুর! আপনি যাঁহার হস্ত এখনও প্রীতি ভরে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তিনিই আমার এ অবস্থা করিয়াছেন"

লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোপে সহসা খাজা কুতবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র মুখমণ্ডল মলিন ও মস্তক নত হইয়া পড়িল। এই অযথা অপবাদ কিরূপে খণ্ডন হইবে তিনি মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার পীর হজরত খাজা মঈন-দ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) র কথাও তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সোলতান সামসুদ্দীনও চিন্তাযুক্ত হইলেন। এত বড় তাপসের বিরুদ্ধে এরূপ কুৎসিত অভিযোগ! একি কম কথা!

এমন সময় খাজা সাহেব তথায় দেখা দিলেন। তিনি সস্নেহ সম্বোধনে বলিলেন,—

"বৎস্য কুতবউদ্দীন! কি জন্য আমাকে স্মরণ করিতেছ? তোমার মুখ কান্তি বা কি কারণে এত মলিন হইয়া পড়িয়াছে?"

খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) লজ্জায় সে প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, নীরবে অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুইচক্ষু হইতে অবিরল ধারে দুঃখাশ্রু ঝরিতে লাগিল খাজা সাহেবের নিকট কিছুই অজ্ঞাত নাই। তিনি প্রিয় শিষ্যের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিয়া লইলেন এবং সেই অভিযোগকারিণী রমণীর উদরের দিকে দৃষ্টি সংযোজিত করিয়া বলিলেন;—

"হে গর্ভস্থ শিশু! তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর, তোমার মাতার অভিযোগ কতদূর সত্য।"

খোদাতালার অপূর্ব্ব মহিমা! অষ্টম মাসের গর্ভস্থ শিশু, কথা কহিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল মাতৃ উদরে থাকিয়া শিশু বলিল,—

"হে তাপস প্রবর! আমার মাতৃবাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা! অন্য এক পুরুষের অবৈধ মিলনে আমার জন্ম। যাঁহার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে তিনি অতি পবিত্রাত্মা।"

অভিযোগ কারিণী রমণী সত্যই কুলটা ছিল। সে অনেক দিন হইতে ব্যাভিচার করিয়া আসিতেছে এখন সে মনে করিয়াছিল, খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে কোনরূপে নেকাহ করিবে এবং তাহা সিদ্ধ হইলে আওলিয়ার সহবাসে তাহার সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া

যাইবে কিন্তু তাহার উদরস্থিত শিশুর সাক্ষ্য শুনিয়া ভয় ও লজ্জায় তাহার দেহের সমস্ত শোণিত শুকাইয়া গেল সে লুঠাইয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সম্রাট সামসুদ্দীন আলতামাস সে কুলটাকে সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিলেন

খাজা সাহেব এরূপ সহস্র সহস্র কেরামত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কেরামতই অলৌকিক। কিন্তু তাহা যে ধ্রুব সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ওলী আওলিয়াগণ ঐশীশক্তি লাভ করিয়া জগতের মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। এ সমস্ত কেরামত কে সন্দেহের চক্ষে দেখা কখন কাহারও উচিত নহে।

যাহা হউক আমরা পুস্তকখানির কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্তির আশঙ্কায় আর অধিক কেরামত লিপি বদ্ধ করিলাম না। সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার এ এটী ক্ষমা করিবেন

খাজা সাহেবের সামায়া পাঠ।

সময় সময় খাজা সাহেবের হৃদয় খোদাপ্রেমে এতই উন্মত্ত হইয়া পড়িত যে, সে সময় তিনি কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তখন তিনি উচ্চস্বরে সামায়া পাঠ করিতেন সামায়া খোদাওন্দতালার প্রশংসা মূলক সঙ্গীত, তাহা আরবী ভাষায় রচিত। তিনি সেই সামায় গাহিয়া হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে শান্তি অনুভব করিতেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন সময় তাঁহাকে সামায়া পাঠ করিতে দেখা যাইত না

সামায়া পাঠ অন্যান্য সকল তরিকাতেই নিষেধ এবং তাহা কখনও কোন আওলিয়াকে পাঠ করিতে দেখা যায় নাই। তাহা কেবল চিশ্‌তীয়া তরিকার পীর, দরবেশ ওলী-আল্লাহ বুজর্গানগণই "জজ্‌বার" হালেতে পাঠ করিতেন

"তয়ারীখ ফেরেস্তা" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। একদা খাজা সাহেবের হৃদয় ঐশীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠায় তিনি চঞ্চল চকিতভাবে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় হজরত বড়পীর সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি খাজা সাহেবের চঞ্চলতা অবলোকন করিয়া বলিলেন,—

"ভ্রাতঃ মঈনদ্দীন! আজ তোমাকে এরূপ ব্যাকুলচিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?"

তাহা শুনিয়া খাজা সাহেব বলিলেন,—

"আমার স্বভাব ত আপনার নিকট অজ্ঞাত নয়—সামায়া

পাঠের জন্যই আমার মন আজ এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিযাছে।”

হজরত বড়পীর সাহেব বলিলেন,—

"ভাই মঈনদ্দীন ! সামায়া পাঠ করা বা তাহা শ্রবণ করা এ দুই-ই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ। তবে তোমার কথা সতন্ত্র। তুমি সামাযা পাঠের উপযুক্ত, সেইজন্য আমি তোমাকে আদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি সানন্দচিত্তে উহা পাঠ বা শ্রবণ করিতে পার ”

অনন্তর খাজা সাহেব একটী সামায়ার মহফেল করিলেন। তাহাতে তিনি খোদাপ্রেমে অধীর হইয়া আরবী ভাষায় সামায়া পাঠ করিতে লাগিলেন ঐশীপ্রেমউন্মাদনার ব্যকুলাবেগে খাজা সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত হজরত বড়পীর সাহেব তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিখানির এক প্রান্ত মাটির উপর রাখিয়া অপর প্রান্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সামায়া পাঠ শেষ হইলে এক বুজর্গান ব্যক্তি হজরত বড়পীর সাহেবকে ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে হজরত বড়পীর সাহেব বলিলেন,—

"ভ্রাতঃ! আমার ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ এই,— মঈনদ্দীনের সুমধুর সামায়া পাঠ শ্রবণে বিরাট পৃথিবী আজ খোদাপ্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে ছিল আমি যদি যষ্টির সাহায্যে তাহাকে ঐরূপ ভাবে চাপিয়া ধরিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ পৃথিবী উল্টাইয়া গিয়া মহা প্রলয় উপস্থিত করিত।

খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র সামায়া পাঠ।

হজরত খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) খাজা সাহেবের প্রধান খলিফা ছিলেন ইঁনিও পীরের পবিত্র পদাঙ্ক অনুস্মরণ করিয়া কোন কোন সময় সামাযা পাঠ করিতেন তিনি উহা পাঠ করিতে করিতে সময় সময় এতই বিভোর ও উন্মত্ত হইযা পড়িতেন যে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একাধিক্রমে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান প্রায় থাকিতেন

"কাওয়াদলসালেকিন" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) একদিন আল্লাহ তালার প্রণযে আত্মহারা হইযা একটী সামাযা পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সামাযা শ্রবণে শ্রোতামণ্ডলী প্রায় সকলেই খোদাপ্রেমে উন্মাদ প্রায় হইযা শেযে সংজ্ঞা শূণ্য হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের সে অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) সাহেব ক্রোধিত হইয়া শেখ ফরিদদ্দীন গঞ্জেসকরকে আদেশ দিলেন,—

" হে ফরিদদ্দীন! তুমি ঐ হতচৈতন্য, ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিদিগের এখনই শিরশ্ছেদ কর।"

পীর সাহেবের আদেশ শ্রবণ করিয়া ফরিদদ্দীন অচৈতন্য ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"হে জ্ঞান বিচ্যুৎ ব্যক্তিগণ। তোমরা শীঘ্র শীঘ্র সজ্ঞান হইযা উঠিযা উপবেশন কর, অন্যথায় আমার পীর সাহেবের আদেশ প্রতিপালনে আমি বিরত হইব না।"

ফরিদদ্দীনের বাক্যে, যাঁহারা সত্য সত্য হতজ্ঞান হইয়া ছিল, তাঁহারা কেহই উঠিলেন না আর যাহারা ভণ্ড। ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল তাহারা তাড়াতাড়ী উঠিয়া বসিল। পীর সাহেব আসল নকল চিনিয়া লইলেন।

চিশ্‌তীয়া তরিকার সামায়া পাঠের দুই প্রকার নিয়ম। প্রথম নামাজ পড়া, দ্বিতীয় নামাজের ঠিক ওযাক্তে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া।

বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) আলায়হে সামায়া পাঠ জনিত মত্ততায় কোন কোন সময় চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্তও বিভোর থাকিতেন কিন্তু তিনি নামাজের প্রতি ওয়াক্তে উঠিয়া ঠিক সজ্ঞানে নামাজ পাঠ করিতেন কোন ওয়াক্তই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না

বখ্‌তিয়ারী সাহেব সামাযা পাঠোন্মত্ত অবস্থায় পরম পাতা খোদাওন্দ তালাকে বিশেষ ভক্তির সহিত দ্বাদশবার সেজ্‌দা করিয়াছিলেন।

"সারেরুল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, সোলতান নিজামদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) বলিয়াছেন,—

সামায়া পাঠ বা শ্রবণ চারি ভাগে বিভক্ত যথা,—

১ম। হালাল। ২য়। মোবাহ। ৩য় মক্‌রুহ। ৪র্থ। হারাম।

প্রথম। যে সকল ব্যক্তি ঐশীপ্রেমে সদামত্ত, যাঁহারা সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয় সাধন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যাঁহাদের শরীরের প্রতি শিরা উপশিরা, এমন কি প্রতি লোম-কূপ হইতে খোদা তালার নাম প্রতি নিয়ত ধ্বনিত হয়, তাঁহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্রের সুর-লয়-বিহীন সামায়া পাঠ বা শ্রবণ করা হালাল।

দ্বিতীয়। যে সকল ব্যক্তি দুনিয়ার আমোদ প্রমোদে কখন লিপ্ত হয়েন না, পার্থিব কোনই সুখ যাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না, তাঁহাদের জন্য সামায়া মোবাহ।

তৃতীয়। যে ব্যক্তি সামায়া পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কোন কোন সময় আল্লাহের প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন তাঁহার জন্য সামায়া মকরুহ

চতুর্থ। যাহারা কেবল খোশ-খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সামায়া পাঠ বা শ্রবণ করে, যাহারা পাক নাপাক অবস্থা ভেদ জ্ঞান করে না আল্লাহ তালাকে বিস্মরণ হইয়া কেবল তান, লয় ও সুরের দিকেই লক্ষ্য করে, তাহাদের জন্য সামায়া হারাম। ইহা কেতাবে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে

একদিন শেখ আলী সনজরী, হজরত বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র খানকায় এক সামায়া মজলিস আরাস্তা করেন। সে সভায়

কেবল চিশ্তিয়া তরিকারই আওলিয়াগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহা ব্যতিত অন্য তরিকার কোন ব্যক্তি সে সভায় ছিলেন না। এবং তাঁহাদের প্রবেশ অধিকার দেওয় হয় নাই। আহাম্মদ জামী ছিলেন সামায়া পাঠক তিনি খোদাপ্রেমিক কামেল ব্যক্তি। যখন তিনি খোদাভাবে বিভোর হইযা নিম্নলিখিত বয়েতটী আবৃত্তি করিলেন,—

কুশ্তে গানে খঞ্জরে তশ্লীম-রা।
হর্ জামা আজ্ গায়েবে জানে দিগা রাস্ত॥

তখন খাজা বখ্তিযার কাকী (রঃ) র আত্মা খোদা তালার দিদার লাভাশায আরসে আজিম পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিল। সামাযার প্রথম মেছ্রা শ্রবণ করিয়াই খাজা সাহেব খোদা-প্রেমে এতদুব উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যখন দ্বিতীয় মেছ্রা আবস্ত হইল, তখন তিনি তাহার সুধাময় স্বরে কি এক প্রকার হইযা গেলেন। তাঁহাব প্রতি শিরা-উপশিরা হইতে আল্লাহ—আল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ আকবর" ধ্বনিত হইতে লাগিল যেমন লোক নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তদ্রূপ প্রকারে তিনি একবার উঠেন আবার পরক্ষণেই পূর্ব্বের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। এইরূপ কখন সজ্ঞান, কখন অজ্ঞান এবং অনাহার-অনিদ্রায় চারি দিবস অতীত হইয়া গেল। এই দীর্ঘ অনাহার-অনিদ্রা জনিত কষ্টে তিনি জীর্ণ-শীর্ণ-মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন তদ্দর্শনে তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহার পীড়া হইয়াছে

মনে করিয়া চিকিৎসার্থে খাজা বখ্‌তিয়ার সাহেবের প্রস্রাব লইয়া এক অভিজ্ঞ হাকিমের নিকট গমন করিলেন হাকিম সাহেব তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—

"আপনার পীর সাহেবের শরীরে অন্য কোন ব্যাধি নাই। তবে তিনি প্রেমের পীড়ায় কাতর যাহা হউক উক্ত পীড়া আরোগ্যের আমি একটী সহজ ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছি ; আপনি তাহাই করিবেন এখনই আপনি গিয়া সামায়া পাঠককে সমায়ার দ্বিতীয় মেছ্‌রা বন্ধ করিয়া প্রথম মেছ্‌রা পাঠ করিতে বলুন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রেমাগ্নি মন্দিভূত হইয়া যাইবে তিনি সাবেক অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন"

শিষ্য হাকিমের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উপরোক্ত ব্যবস্থা করিলেন সেই ব্যবস্থায় খাজা বখ্‌তিয়ার সাহেব পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন

পাঠক! এই ঘটনার দ্বারা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছেন, কেমন ভক্তিপূর্ণ মনে, কিরূপ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহারা সামায়া পাঠ বা শ্রবণ করিতেন কিন্তু হায়! আজ সামায়ার কি দুরবস্থা! কি ঘোর পরিতাপের কথা আজ পাক নাপাক দেখা দেখি নাই, সময় অসময় বিচার-বিবেচনা নাই, স্থান অস্থান বাছাবাছি নাই, পথে ঘাটে লোকে সামায়া পাঠ করিতেছে কোন কোন লোকে সামায়ার সহিত হারমোনিয়ম, বেহালা, তবলা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্য লইতেছে কোন কোন সরাদ্রোহী লোকে উহাকে দোরস্ত বলিয়া ফতুয়া

দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করি হে ফতুয়া দাতা! আপনি কোন হাদিস দলিলানুযায়ী ঐ প্রকার ফতুযা দিয়া থাকেন? আপনি কি জানেন না, হজরত রসুলে করিম (সঃ) ফরমাইয়াছেন,—

"আমার বা আমার তাবে তাবাইন ব্যতীত যাহারা নূতন কোন হাদিস প্রকাশ করিবে তাহারা শয়তানের শিষ্য।"

অধুনা এ দেশে এক শ্রেণীর ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা দুই এক খানি বাঙ্গলা পুঁথি পড়িতে ও যাহা তাহা করিয়া এক আধ খানা পত্র লিখিতে শিখিয়া বিদ্যারূপ সুন্দরী ললনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়াছে। রোজা নামাজের সঙ্গে যাহাদের মোটেই সম্বন্ধ নাই। যাহারা গীত-বাদ্য করিয়া চিশ্‌তীয়া খান্দানের মুরিদ বলিয়া দাবী করে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এই খাজা সাহেবের জীবনী খানি পাঠ করিয়া বুকে হাত দিয়া বল, তোমাব খাজা সাহেবের তরিকায় কি ঐ সমস্ত করা জায়েজ আছে? ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণিত, কি জঘন্য কার্য্য, যাহা প্রকাশ করিতে লজ্জায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, লেখনি কলঙ্কিত হইয়া পড়ে—স্ত্রী পুরুষে এক সভায় গান বাদ্য করা, পরস্পর পরস্পরকে কামাতুর হইয়া জড়াইয়া ধরা এ সব কি? কোন কেতাবের নিয়মানুসারে ইহা তোমরা সঙ্গত বিবেচনা করিযাছ। হায় রে ভণ্ডের দল! তোমবা কি জান না, এ সমস্ত একবারেই গর্হিত কার্য্য; এ জন্য খোদা তালার কাছে জবাব দেহি করিতে সক্ষম হইবে না—

দোজখের আগুনে দিবারাত্র পুড়িয়া মরিবে আমি আমার সরার পরিপোষক ভ্রাতৃবর্গকে জানাইতেছি ভাইগণ! আপনারা সাবধান! আপনারা ঐ সমস্ত ভণ্ড সমাজদ্রোহী, ফকিরদিগের ছলনায় ভুলিবেন না উহাদের সংশ্রবে কখনও যাইবেন না। উহারা সমাজের আবর্জ্জনা; সয়তানের সহচররূপে লোকের ইমান নষ্ট করিতেছে আপনারা বিষধর সর্প বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা উহাদের ত্যাগ করিয়া চলিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের খেলাফতি প্রাপ্ত।

খাজা সাহেব হিন্দুগণের বহু বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ভারতে ইস্‌লাম প্রচার করিতে লাগিলেন তাঁহার প্রচার গুণে হিন্দুস্থানের প্রায় সর্ব্বত্রে ইস্‌লামের উজ্জ্বল আলোক ছড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বত্রই বিমল শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এমন সময় তাঁহার পীর হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন খাজা সাহেব স্বীয় পীর সাহেবের আহ্বান শ্রবণ করিয়া কাল বিলম্ব করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ পীরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি খোরাসান সীমান্তে যাইয়া পীরের দর্শন পাইলেন বহুদিন পরে গুরু শিষ্যে সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ অনুভব করিলেন। হজরৎ ওস্‌মান হারুনী (রঃ) তাঁহার প্রিয় শিষ্য খাজা সাহেবকে পার্শ্বে বসাইয়া সুমধুর স্বরে বলিলেন,—

"বৎস্য! আমি হেজারত করিতে বাসনা করিয়াছি; আমি যত শীঘ্র পারি মক্কা শরিফ গমন করিব। আর আমার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বাসনা নাই। আমার পীর হজরত হাজী শরিফ জেন্দানী (রঃ) তাঁহার অন্তিম সময়ে আমাকে কতকগুলি

জিনিষ দিয়া গিয়াছেন আমি এতদিন সে গুলি বহু যত্নের সঙ্গে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আর তাহা পারিলাম না, আমারও অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী এ জন্য সে গুলি রক্ষার ভার আমি তোমার উপর প্রদান করিতেছি। আশা করি, তোমার নিকট সে গুলির অযত্ন হইবে না।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার পীর প্রদত্ত আশা, মসাল্লা, খেরকা, জুতো ও পাগড়ী খাজা সাহেবকে প্রদান করিলেন। খাজা সাহেব বহু সম্মান সহকারে পীরের দান গ্রহণ করিলেন। ইহাই খাজা সাহেবের খেলাফতি প্রাপ্ত অতঃপর খাজা সাহেব পীরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আজমীর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন

"সওয়ানীয়ে উমরী" গ্রন্থে বর্ণিত হইযাছে। খাজা সাহেবের বিদাযের পর হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) পবিত্র ভূমি মক্কা শরিফ গমন করেন। এবং তথায় একটী হোজরা গৃহ লইয়া বিশ্ব পালক খোদাতালার এবাদতে নিরত থাকেন। এ মর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই না। পৃথিবী পান্থ নিবাস। এখানে কেহ সুচিরকালের জন্য থাকিতে আসে না। পীর পয়গম্বর বাদসা-ফকির সকলকেই এ প্রবাস ভবন ত্যাগ করিতে হয়। হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) ও এ স্থানে রহিলেন না। তিনি ৬০৭ ছয় শত সাত হিজরীর সওয়াল মাসের ১৪ই তারিখে এ নশ্বর জগতের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন

খাজা সাহেবের পরদুঃখ কাতরতা।

একটী কৃষক কয়েক বিঘা জমি চাষাবাদাদী করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কলত্র লইয়া কালযাপন করিত কিন্তু জমিদারের নজরে তাহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। তাই তিনি সমস্ত ভূমি বল পূর্ব্বক খাশ করিয়া লইয়া কৃষককে বলিলেন,—

"তুমি বাদসার নিকট হইতে যতদিন পর্য্যন্ত হুকুমনামা না আনিতে পারিবে ততদিন জমির ত্রিসীমায় যাইও না।"

কৃষক নিরুপায় হইয়া খাজা সাহেবের নিকট আসিল এবং তাহার দুঃখের বিষয় নিবেদন করিল। খাজা সাহেব কৃষকের কাতরতা দর্শনে হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা বোধ করিলেন। তিনি কৃষককে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বৎস্য! তুমি জমির জন্য চিন্তা করিও না, আমি বাদসাকে বলিযা তোমার ভূমি নিস্কর করিয়া দিব।"

এই বলিয়া খাজা সাহেব তখনই সেই কৃষককে সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন যথা সময়ে তিনি দিল্লী উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য হজরত কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) তাঁহার দিল্লী আগমনের কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি কিয়দ্দূর পথ অগ্র গমন করিয়া খাজা সাহেবকে তাঁহার আস্তানায় লইয়া গেলেন এবং তাঁহার এরূপ হঠাৎ আগমনের

খাজা সাহেবের পরিবার

খাজা সাহেব দ্বার পরিগ্রহণ করেন নাই। তিনি হজরত ঈসা আলায়হেস্ সাল্লামের মতই সন্ন্যাস ব্রত পালন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাই

"আক্‌সির নামা" নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, সোলতান তারেকিন মৌলানা হামিদদ্দীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। একদা রাত্রিকালে খাজা সাহেব নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্নে দেখিলেন, নবীকুলরবি কোরেশ বংশ গৌরব, মানব জাতির শিরোভূষণ, নিখিল বিশ্বের বক্ষের নিধি, জগৎ পতির প্রিয় সুহৃদ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) তাঁহার নিকট আসিয়া স্বর্গসুধা নিস্যন্দিনী স্বরে, বলিলেন, "প্রিয় বৎস্য আমার, আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রদীপ! তোমার প্রতিকার্য্যে আমি সবিশেষ সুখি সকল বিষয়েই তুমি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছ তুমি আমার দীন বলিয়া গণ্য। কিন্তু বৎস্য! একটী বিষয়ে তোমাকে উদাসীন দেখিতেছি কেন? কেন তুমি আজিও আমার সে নীতির সম্মান প্রদান করিতেছ না। যাহা হউক, অতঃপর তুমি আমার সে নীতি প্রতিপালন করিয়া আমার প্রবর্ত্তিত সকল নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিবে। তুমি

দ্বার পরিগ্রহণ করিয়া সংসারি হও ইহা মনে রাখিও, আমার রীতিকে যে ব্যক্তি শিথিল করে, তাহার প্রতি আমার ভাল বাসাও শিথিল হইয়া যায়। আমার কার্য্য-কলাপ যাহার মনোনীত নহে, আমিও তাহাকে মনোনীত করি না।"

খাজা সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন বিবাহ না করিয়া নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। পরদিনই তিনি পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। খাজা সাহেবের বিবাহের পাত্রীর অভাব হইল না তিনি ৯০ নব্বই বৎসর বয়সে দ্বারগড়ের রাজকন্যার পাণীগ্রহণ করিলেন। আবার অল্পদিন পরে তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য সৈয়দ হোসেন মসাহাদী স্বপ্ন দেখিলেন, হজরত এমাম জাফর সাদেক (রাজিঃ) তাঁহাকে বলিলেন ;—"হোসেন! তুমি খাজা সাহেবের সঙ্গে তোমার আস্‌মাহ নামক কন্যার শুভ বিবাহ দেও।"

বলা বাহুল্য সৈয়দ হোসেন মসাহাদী পরদিনই খাজা সাহেবকে জামাতা পদে অভিসিক্ত করিলেন

খাজা সাহেবের প্রথমা পত্নী রাজদুহিতা উম্মেতুল্লা যথা সময়ে দুই পুত্র ও একটি কন্যা রত্নের জননী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম মওলানা সৈয়দ ফখরুদ্দীন (রঃ) দ্বিতীয় পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয। আর কন্যার নাম হাফেজ জামাল।

খাজা সাহেবের দ্বিতীয়া পত্নী সৈয়দা আস্‌মাহ বিবি তিন

পুত্রের মাতা হইয়া ছিলেন তাঁহার প্রথম পুত্র খাজা মহিউদ্দীন মোহাম্মদ আজ্‌মেরী, দ্বিতীয়ের নাম খাজা জিয়াউদ্দীন আবুল খায়ের, তৃতীয় শেখ হেসামদ্দীন (রঃ)। শেখ হেসামদ্দীন (রঃ) সদা সর্ব্বদা হজরত কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র সহবাসে থাকিতেন

খাজা সাহেব স্ত্রী-পুত্র লইয়া মাত্র সাত বৎসর সংসার ধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

খাজা সাহেবের শিষ্য।

খাজা সাহেবের শিষ্য অসংখ্য তাহার মধ্যে ১২০ এক শত কুড়ি জন চিশ্‌তীয়া তরিকা অবলম্বনে উপাসনা আরাধনা করিয়া বিশেষ সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আবার ৬৫ জন ব্যক্তি সাধন কার্য্যে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়া ওলী আল্লাহ হইয়া ছিলেন আবার তাঁহাদেব মধ্য হইতে প্রধান্য লাভ করিয়াছিলেন হজরত খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ)। হজরত কাকী প্রথম শ্রেণীর আওলিয়া। কথিত আছে, তিনি মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবার সময় ৩০ তিরিশ পারা কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া ছিলেন এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"সওয়ানীয়ে উমরী" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে একদা হজরত বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) বহু বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তায় পরিব্যপৃত ছিলেন সেদিন ঈদোজ্জোহা। হজের নির্দ্দিষ্ট সময় তখনও উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। তখন সেই মজলিসের কয়েক ব্যক্তি হজের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"এইবার লক্ষ লক্ষ লোক হজব্রত পালন করিয়া অশেষ পূণ্যের অধিকারী হইবে।"

হজরত বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"সত্যই তাহারা যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মক্কা গমন করিয়াছে এইবার তাহার সার্থকতা লাভ হইবে, কিন্তু এ কথাও সত্য, এমন লোকও দুনিয়ায় বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা দূর মক্কা ধামে কষ্ট স্বীকার করিয়া গমন করেন না অথচ হজ ব্রত পালন করিয়া থাকেন তাঁহারা তওয়াফ করিবার জন্য পবিত্র কাবা শরিফকে নিজালয়ে আনিয়া থাকেন"

কি আশ্চার্য্য কাণ্ড! কি অভূত পূর্ব্ব ঘটনা! তাঁহার উপরোক্ত বাক্য শেষ হইতে না হইতেই পবিত্র কাবা শরিফ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হজরত বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) তখন সবান্ধবে উঠিয়া পূত হজকার্য্য পালনে নিরত হইলেন। তিনি উচ্চস্বরে তকবির পড়িয়া হজ আদায় করিলেন এবং উম্মতে মোহাম্মদীর মুক্তির জন্য হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন দৈববাণী হইল,—

"হে কুতবদ্দীন, আমার প্রিয় ভক্ত! আমি তোমার ও তোমার সুহৃদবর্গের হজ মঞ্জুর করিলাম এবং তোমাদের সবাকার প্রার্থনা সাদরে গৃহীত হইল"

এই অভয়প্রদ দৈববাণী শুনিয়া সকলেই যার-পর-নাই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং তাঁহারা অপরিসীম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া "মার হাবা, মার হাবা" শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

হজরত খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র এ অতুলনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির কথা তখনই দিল্লী নগরের দিকে দিকে

ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহা শুনিয়া নগববাসীগণ তাঁহাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান কবিতে লাগিল।

খাজা সাহেবের খেলাফতিদান

ওলী-আওলিয়া গোওস-কুতব প্রভৃতি, সাধু-দরবেশ গণ তাঁহাদের অন্তিম সময় জানিতে পাবেন খাজা সাহেবও তাঁহার মৃত্যুর সময় বুঝিতে পারিযা ছিলেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার খেলাফতিপদ কাহাকে প্রদান করিবেন তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ঐরূপ চিন্তা করিতে কবিতে তিনি নিদ্রিত হইলে, আল্লাহ তালাব প্রিয়বন্ধু, পযগম্বর কুল তিলক, পাপী-তাপীর ভরসার স্থল, বিশ্বমানবের মুক্তি প্রয়াসী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ) তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন,—

"প্রিয় বৎস্য! তুমি এত চিন্তিত হইও না তোমার খেলাফতি গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র, তোমার প্রিয় শিষ্য কুতবদ্দীন। তাহাকে তুমি তোমার খেলাফতি দান কব"

তিনি আরও বলিলেন,—

"কুতবদ্দীন আমারও প্রকৃত বন্ধু। তাহাব মত শুদ্ধাত্মা, ধার্ম্মিক ব্যক্তি উপস্থিত তুমি আর কাহাকেও পাইবে না। আমি

তাহাকে উপযুক্ত মনোনীত করিয়াছি। অতএব তুমি ইহাতে আর ইতস্ততঃ করিও না ”

এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর খাজা সাহেব কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সুহৃদ খাজা কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) কে আজমীর আসিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদ বাহক সেইদিনই দিল্লী যাত্রা করিল।

যথা সময়ে বাহক দিল্লী পৌছিয়া হজরত বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) কে খাজা সাহেবের আদেশ জ্ঞাত করিল তিনি তাঁহার পরম ভক্তি ও শ্রোদ্ধার পাত্র পীর সাহেবের আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আজ্‌মীর যাত্রা করিলেন এবং যথা সময়ে তথায় পৌছিয়া পীর সাহেবের সাক্ষাৎ লাভে সুখি হইলেন তখন খাজা সাহেব আজ্‌মীরের জামে মস্‌জিদে একটী সভা আহবান করিলেন। সেই সভায় তিনি তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীকে সম্বোধন করিযা বলিতে লাগিলেন,—

“হে আমার প্রিয় শিষ্যবর্গ! তোমরা অবশ্যই জান এ পৃথিবী আমাদের প্রবাস গৃহ এখানে চিরদিন বসবাস করিবে বলিয়া কেহ আইসে না। আমাদের চিরশান্তি নিকেতন পবিত্র ভূমি স্বর্গধাম। তথায় গমন করিতে হইলে প্রথম আয়ু রূপ সমুদ্র পার হওয়া দরকার। মৃত্যু সকলকে সেই আয়ু সমুদ্র পার করিয়া পরকালের কূলে পৌছাইয়া দেয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মৃত্যুকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবে তাহারা, যাহারা চিরজীবন পাপের পথে

বিচরণ করিতেছে। যাহাদের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। ভীষণ নরকাগ্নি লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া যাহাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। আর মোমেনের জন্য মৃত্যু, খোদাওন্দতালার মহা দান—তাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহের পূর্ণ বিকাশ। কেননা মোমেন লোকের হৃদয় নিহিত ভক্তিরাশি উচ্ছ্বসিত নদী প্রবাহের ন্যায় অবিরাম গতি ধেয়ে চলেছে, আর মৃত্যু খোদা তালার প্রেম রূপ অসীম সমুদ্রের সহিত সেই প্রবাহকে মিলিত করিয়া দিয়া তাহাকে শান্ত-সুধীর করিয়া দেয় অতএব বৎসগণ! তোমরা মৃত্যুকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিবে।”

অতঃপর তিনি নীরব হইলেন তাঁহার ওয়াজ শ্রবণে সভাস্থ সকল ব্যক্তির হৃদয়ই ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল নশ্বর জগতের যাবতীয় বন্ধন যেন মুহূর্ত্তে তাঁহাদের শিথিল হইয়া গেল।

খাজা সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন,—

“বৎসগণ! মৃত্যুর বিজয় শকট নিত্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বক্ষ পঞ্জর চূর্ণ করিয়া রুদ্র বিক্রমে ছুটিয়া চলিযাছে তাহার সে গতি প্রতিহত করিবার সাধ্য কাহার নাই কাননবাসী সন্ন্যাসী হইতে জগত বিজয়ী সম্রাটও তাহা রোধ করিতে পারে না, আমিও তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব না। আমার সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে। অতএব তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার খেলাফতি, যাহা আমি আমার পরম ভক্তি ভাজন পীর হজরত ওসমান হারুনী (রঃ) হইতে প্রাপ্ত হইযাছি, সেই খেলাফতি পদ আমার প্রিয় শিষ্য কুতবদ্দীন বখ্তিয়ারকে প্রদান

করিতেছি আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের যে কোন বিষয়ের মীমাংসা তাহা কুতবদ্দীনই সমাধা করিবে।"

অতঃপর তিনি তাঁহার অন্যতম শিষ্য আলী সনঞ্জরীকে বলিলেন,—

"বৎস্য আলী. তুমি এখনই একটী খেলাফত নামা লিখিয়া দাও।"

আলী সনঞ্জরী তৎক্ষণাৎ খেলাফত নামা লিখিয়া খাজা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন তিনি তাহা পাঠ করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন

"দলিল আরফিন" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে

খাজা সাহেব প্রথমে বিশ্ব বিধাতা খোদা ওন্দতালাব উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা করিয়া পরে হজরত কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার সাহেবকে নিকটে ডাকিলেন। পীর সাহেবের আদেশে কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) তৎক্ষণাৎ খাজা সাহেবের সম্মুখীন হইয়া আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন হজরত খাজা সাহেব তখন খেলাফতনামাখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন এবং মস্তক হইতে স্বীয় পাগড়ী খুলিয়া কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র মস্তকে পরাইয়া দিলেন এতদ্ব্যতীত তিনি খেরকা, জুতা, আশা, মছাল্লা ও একখানি কোরাণ শরিফ তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বৎস্য কুতবদ্দীন! এই যে সমস্ত জিনিষ আমি তোমাকে প্রদান করিলাম এ গুলি অতি পবিত্র বস্তু, এ নশ্বর জগতে এই

সকল জিনিষের মূল্য কেহ দিতে সক্ষম নয়। নবীকুলের গৌরব-রবি হজরত রসুলে করিম (সঃ) এ গুলি আমার ভক্তি ভাজন পীর হজরত ওস্‌মান হারুনী (রঃ) কে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে এ গুলি দান করিয়া গিয়াছেন আমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে এ সমস্ত গচ্ছিত রত্ন এত দিন যত্ন করিয়া রক্ষা 'করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আর পারিতেছি না, আমার অন্তিম সময় সন্নিকট আমি এ গুলি তোমাকে দিলাম। দেখিও বৎস্য! নবী প্রদত্ত এ সমস্ত পবিত্র জিনিষেব তোমার নিকট যেন কোন অসম্মান না হয় তুমি যদি একটু অনাদর-অশ্রোদ্ধা কব তাহা হইলে কেয়ামতের দিন খোদা তালার নিকট আমাকে বিশেষ লজ্জিত হইতে হইবে"

তৎপরে তিনি কুতবদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ) র হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"হে বিশ্বপালক! সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা! আপনার ভক্ত, আমার এই প্রিয়শিষ্যকে আপনার করেই সমর্পণ করিলাম আপনি তাহাকে রক্ষা করিবেন"

তিনি সমবেত শিষ্য মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বৎস্যগণ! এখন হইতে তোমরা কুতবদ্দীনকে আমার খলিফা জ্ঞান করিয়া সম্মান প্রদান করিবে। আর তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পর আমার 'মাজার' এই খানেই নির্ম্মাণ করিবে।"

সকলেই বহু সম্মান প্রদান করিয়া খাজা সাহেবের সে

কথা স্বীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর সভার কার্য্য শেষ হইল।

খাজা সাহেবের পরলোক গমন।

খেলাফতি প্রদানের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন খাজা সাহেব এসার নামাজ বাদ তিনি তাঁহার খাদেম কে ডাকিয়া বলিলেন,—

"দেখ আমি হোজরাগৃহে গমন করিতেছি, তোমরা কেহ আমাকে ডাকিও না, বা হোজরাগৃহে প্রবেশ করিও না সাবধান! আমাব আদেশের যেন না কোন ব্যতিক্রম ঘটে।"

এই বলিয়া তিনি হোজরাগৃহে প্রবেশ করিলেন। খাদেম প্রহরী রূপে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। খাদেম বিনিদ্র অবস্থায় হোজরার দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তিনি প্রতিনিয়ত খাজা সাহেবের হোজরা মধ্যে পদ সঞ্চালন ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন রাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইল তখন আর তিনি কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। অল্পক্ষণ পরে প্রভাত হইল। আজানের মধুর স্বর লহরী বায়ুভরে দিকে দিকে ভাসিয়া চলিল পক্ষীকুলের কোমল-মধুর কাকলিতে গগণ পবন মুখরিত হইল তথাপি খাজ সাহেব হোজরা গৃহ হইতে বাহির হইলেন না তাঁহার শিষ্যগণ একে একে আসিয়া

অনেকেই হোজরাগৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন খাজা সাহেব তখনও পর্য্যন্ত হোজরা হইতে বাহির না হওয়ায় তাঁহাদের সকলের মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল 'হয়ত খাজা সাহেব আর ইহলোকে নাই ' এরূপ সন্দেহের আরও কারণ এই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাত্রে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন তিনি স্বর্গীয় সুধা মাখা স্বরে বলিলেন,—

"বৎসগণ! আজ আমি আমার প্রিয় বন্ধু খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলাম।"

যাহা হউক তাঁহারা হোজরার দ্বারদেশে বার বার আঘাত করিয়া খাজা সাহেবকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না তখন তাঁহাদের সন্দেহ ছায়া আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল তাঁহারা মনে করিলেন; নিশ্চয়ই খাজা সাহেব ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা তখন হোজরার দ্বার উদ্ঘাটন করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা তাহাই করিলেন। নানা কৌশল অবলম্বনে হোজরার দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন এবং হোজরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, খাজা সাহেবের পবিত্র দেহে প্রাণবায়ু আর নাই। হেন্দাল ওলী নশ্বর জগতে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অনাবিল শান্তি নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন আওলিয়া গৌরব রবি খাজা মঈনদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) ৯৭ সাতানব্বুই বৎসর জীবিত

থাকিয়া জগতের অশেষ উপকার সাধন করিয়া ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব মাসে মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

খাজা সাহেবের মাজার শরিফ।

পবিত্র ভূমি আজ্‌মীর শরিফেই খাজা সাহেবের নির্দ্দেশিত স্থানে তাঁহার সমাধিগৃহ। সমাধিগৃহের পত্তন করিয়াছিলেন মহাত্মা হোসেন নাস্তরি তাহার পর দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট মহামতি জেলালদ্দীন আকবর শাহ তাহার সবিশেষ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সেই কবরটীকে বেষ্টন করিয়া শ্বেত প্রস্তরের এক বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজ্‌মীরের সমগ্র প্রাসাদের মধ্যে খাজা সাহেবের সমাধি সৌধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌধের ভিতরে খাজা সাহেবের কবরের উপরে যে একটী আস্তরণ আছে, তাহার মূল্য লক্ষ টাকা হইবে। এতদ্ব্যতীত এক জোড়া মূল্যবান হীরক কবরেব উপরে টাঙ্গান আছে। খাজা সাহেবের উপর সম্রাট আকবরের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, সেইজন্য তিনি মাজার শরিফের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ৭০০০০ সত্তর হাজার টাকার আয়ের জায়গীর দিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সেই জায়গীরের আয়েই মাজার শরিফের খরচ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, মাজাররক্ষক খাদেমগণ মাজার জিয়ারতকারিদিগের নিকট হইতে খাজা

সাহেবের নিয়াজ বলিয়া ১০৲ ২০৲ দশ বিশ টাকা গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদের হাত হইতে গরীব লোকও রক্ষা পায় না। তদ্ব্যতীত তাহারা অশিক্ষিত লোকদিগকে খাজা সাহেবের কবরে সেজ্‌দা করায়। ইহাতে অজ্ঞ লোক সকল পূণ্যের পরিবর্ত্তে যে পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহা ছাড়া আরও অনেক অকার্য্য-কুকার্য্য তথায় হইয়া থাকে কওয়ালওয়ালারা তথায় দিবা রাত্র গীত বাদ্য করে। ইহা যে পাপ কার্য্য তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই যাহা সেরেক-বেদাত তাহা সকল সময় সকল স্থানেই পাপকার্য্য বলিয়া গণ্য খাজা সাহেবের মাজারে হইলেও তাহাতে পাপ ব্যতীত পূণ্যার্জ্জন হয় না এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার।

বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট জেলালদ্দীন আহাম্মদ আকবর শাহ ৯৭৮ নয়শত আটাত্তর হিজরীতে খাজা সাহেবের 'মাজার' জিয়ারত করিতে গিয়া তথায় তিনি এক সুরম্য মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন মসজিদটী লাল ও শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ ১৪০ এক শত চল্লিশ ফিট, উচ্চতায় ৫৬ ছাপান্ন ফিট। কথিত আছে আকবর শাহ মাজার শরিফের সম্মান রক্ষার্থে কোন যানারোহণে গমন করেন নাই আগ্রা হইতে আজমীর ২৩২ দুই শত বত্রিশ মাইল পথ। সমুদয় পথ তিনি পদব্রজে গিয়াছিলেন।

মাজার শরিফের নিকটে পাকা চুল্লীর উপর দুইটী প্রকাণ্ড

তামার দেগ্‌টী আছে অদ্যাবধী খাজা সাহেবের উরসের সময় প্রতি বৎসরই উহাতে অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে দেগ্‌টী দুইটীর একটীতে আশী মণ, অপরটীতে একশত মণ, চাউলের ভাত প্রস্তুত হয়। সম্রাট অকবর ৯৭৪ নয়শত চুয়াত্তর হিজরীতে চিতোর দুর্গ জয় করিয়া আজ্‌মীরের দরিদ্র লোকদিগকে উক্ত বড় দেগ্‌টীটীর এক দেগ্‌টী পোলাও ভোজন করাইয়া জয়োৎসব সমাধা করিয়াছিলেন।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পরাক্রান্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ ১০৩২ হিজরীতে ছোট দেগ্‌টীটী পূর্ণ অন্ন প্রস্তুত করাইয়া অতিথিদিগকে ভোজন করাইযা ছিলেন

প্রতি বৎসর রজব মাসের ৬ই হইতে ১১ই পর্য্যন্ত খাজা সাহেবের উরস হয়। ঐ উরসে দেশ দেশান্তর হইতে বহু লোক যাইয়া যোগদান করেন খাজা সাহেবের পবিত্র জীবনী এই খানেই আমি সমাপ্ত করিলাম

সম্বর্দ্ধনা

একান্ত আল্লাহ ভক্ত ধার্ম্মিক প্রধান,
নবীর সুহৃদ সত্য তুমি মহ প্রাণ
জগতের যাবতীয় জীবের কল্যাণ,
সাধিতে জনম তব সাধক মহান।
অধর্ম্মে ডুবিয়াছিল সারা হিন্দুস্থান,

তুমি আসি করিলে গো আলোক প্রদান।
তোমার প্রসাদে হল অন্ধকার দূর,
ভাতিল ভারতবর্ষে ইস্‌লামের নুর।
আলোক দেখিয়া লোক পুলক অপার,
গাহিতে লাগিল সুখে মহিমা খোদার
উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ ব্যতীত,
হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহারি প্রেরিত
এই মহা সত্য কথা সকলে বুঝিল,
অসার প্রতিমা পূজা সবে ছেড়ে দিল।
মুক্তির নূতন পথ সৃজন তোমার,
"চিস্তিয়া তরিকা" হল জগতে প্রচার
শক্তিহীন এ লেখক দীন বঙ্গ ভাষা,
বর্ণিতে অক্ষম প্রভু তোমার প্রশংসা।
ভ্রম ত্রুটী ক্ষমা কর ওহে গুণধাম,
চরণ-কমলে তব হাজার সালাম

সম্পূর্ণ

গ্রন্থকারেব মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুস্তকখানির আদি অন্ত সংস্কার করিয়া প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গ সন্তোষ লাভ করিলেই অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। প্রকাশক।

ওস্‌মানিয়া লাইব্রেরী

স্থাপিত ১৯১৬ সালে।

আমাদের নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মোহাম্মদ কোরবান আলী প্রণীত

ধর্ম্মতত্ত্বের অফুরন্ত খনি

উম্‌দাতুল ইস্‌লাম।

বিগত তিন যুগ হইতে যে রত্ন বঙ্গভাষাভাণ্ডারে আপনারা দেখিতে পান নাই। আজ এই কলিযুগে বহু পরিশ্রমে আরবী ও পার্শী গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করিয়া সেই মহারত্ন উদ্ধার পূর্ব্বক আপনাদের কর-কমলে প্রদান করিলাম। বঙ্গভাষাভাষী প্রিয় পাঠক-পাঠিকা শুনিয়া সুখি হইবেন যে, আমরা বহু আয়াসে আরবী পার্শী ধর্ম্মগ্রন্থ রাশির সারাংশ চয়ন করিয়া "উম্‌দাতল ইস্‌লাম" নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রনয়ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে রোজা -নামাজ, হজ-জাকাত দোয়া-দরূদ আহার-বিহার ভজনা-আরাধনা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ইস্‌লাম সন্তানগণের অতি প্রয়োজনীয় নিত্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এই ধর্ম্মতত্ত্ব পূর্ণ পবিত্র গ্রন্থখানি সকলেরই পরম আদরের বস্তু ইহার এক এক খণ্ড গৃহে রাখা মুসলমান মাত্রেরই উচিৎ। পুস্তক খানির ভাষা সরল ও মধুর এমন কি অল্পশিক্ষিত লোকেও ইহা সহজে পাঠ করিতে পারিবে। মূল্য ১৸০ সডাক ২৲ টাকা মাত্র

ইস্‌লাম সঙ্গীত

বা

সহজ হীরক খনি

ইস্‌লাম সমাজ নেতা ভ্রাতাবৃন্দের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনারা শরিয়তের বিরুদ্ধ বিজাতীয় সঙ্গীত শ্রবণে কিম্বা তাহা গাহিয়া পাপের বোঝা কেন মাথায় চাপাইতেছেন? যদিও সঙ্গীত মানবের মন কষ্ট দূরীভুত করিয়া হৃদয়ে আনন্দ সুধা দান করিতে সক্ষম বটে এবং একথা কেহ অস্বীকার না করিলেও তথাপি শরিয়েত তাহা শুনিবে না, হাদিস তাহাকে কোন কালে জায়েজ বলিয়া প্রমাণ দিবে না। সঙ্গীত মনতুষ্টির যতই উপাদেয় বস্তু হউক না কেন ধর্ম্মামতানুসারে তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ ইহা সতঃই সত্য যে, খোদার বান্দা, রসুলের উম্মত হইয়া হিন্দু দেব দেবীর প্রশংসা মূলক গান গাওয়া নিতান্তই অন্যায়, যার-পর-নাই ঘৃণার কথা আপনারা হয়ত বলিতে পারেন তাহা ছাড়া আমাদেব উপায় কি?—ইস্‌লামীয় মতে কোন সঙ্গীত ত এপর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষায় বাহির হয় নাই। তদুত্তরে আমরা নিবেদন করিতেছি, কে বলিল হয় নাই? আমরা আপনাদের সে অভাব মোচনার্থে বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে "ইস্‌লাম সঙ্গীত' বা "সহজ হীবক খনি' বাহির করিয়াছি। ইহাতে কেবল খোদা রসুলেব প্রশংসা মুলক মধুর সঙ্গীত। এতদ্ব্যতীত অসার গান একটীও নাই। ইহার প্রত্যেক গীতিই দরূদ শরিফের অনুকরণে রচিত, গজলের ন্যায় দেশীয় সুর লয়ে যেমন ইচ্ছা সেই ভাবে গাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক গানেই হৃদয় মন খোদা ও রছুলের প্রেমে বিভোর হইয়া উঠে পিতা-পুত্র ভাই-ভগ্নী স্ত্রী-কন্যা একত্রে বসিয়া ইহার গান শুনিতে পারিবেন। এ উপাদেয় সঙ্গীত সকলেই এক একখানি ক্রয় করুন; মূল্য অতি সামান্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

উপন্যাস জগতের গরিয়সী রাণী

মনোয়ারা

মনোয়ারা একাধারে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। বঙ্গীয় মোস্‌লেম জাতীয় সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত একখানিও এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হয় নাই সংসারের নিখুঁত ছবি, অনাবিল প্রেমের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, রোজা-নামাজ হজ-জাকাতও মৌলুদ শরিফের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহাতে দেখিতে পাইবেন। পাপীর পতন, পুণ্যাত্মার পুরস্কার, ইহাতে স্পষ্ট রূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ইহাতে বিপন্নের হাহাকার, হৃদয় বানের সদয় ব্যবহারও দেখিতে পাইবেন আরও দেখিবেন, রহস্যপূর্ণ ষড়যন্ত্র, ভীষণ হত্যাকাণ্ড, সত্যের অপূর্ব্ব আবিষ্কার পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে কোথাও প্রাণের উচ্ছ্বাসিত আবেগ বাশি উচ্চ ক্রন্দন রোলে ফুটিয়া উঠিবে, কোথাও বা হৃদয়ের কলুষভাব অপসারিত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দে মন প্রাণ বিভোর হইয়া পড়িবে। একবার পড়িতে বসিলে পুস্তকখানি শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। বাস্তবিক ইহার ভাব হৃদয়স্পর্শী, ভাষা শ্রুতিমধুর; ঘটনা বিবরণ অভুতপূর্ব্ব ও স্বাভাবিক। আপনার যদি উপন্যাস পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে বাসনা থাকে তবে অদ্যই মনোয়ারার জন্য পত্র লিখুন। আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হইবে, অনাবিল আনন্দ রসে হৃদয় মন ভরিয়া উঠিবে। উত্তম কাগজে, সুচারু ছাপা, সোনার অক্ষরে নাম লেখা, সুন্দর সিল্কের মনোজ্ঞ বাধাই মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

আমাদের রেজিষ্টারী কৃত গ্রন্থাবলী।

মেফতাহুল জেন্নাত মূল্য ।৵০

বঙ্গের ইস্‌লাম প্রচারক জনাব মৌলানা কারামত আলি সাহেবের প্রণীত উর্দ্দু মেফতাহুল জেন্নাতের অবিকল বাংলা তরজমা।

বড় খয়রল হাসার। মূল্য ॥০

যদি হাসার ময়দানের, শেষ বিচারের কথা জানিতে বাসনা থাকে তবে "শেখ উমর উদ্দিন সাহেব" প্রণীত খয়রল হাসার পাঠ করুন।

ছহি আখবারচ্ছলাত। মূল্য ।৵০

যদি বিনা ওস্তাদে নামাজ পড়া শিক্ষা করিয়া, নামাজ পাড়্তে বিবাহ পড়ান ও তালাকের কথা জানিতে চাহেন তবে আখবারছালাত লউন।

আরবা আরবাইন হাদিস। মূল্য ／১০

শেষ নবী রসুল করিম (ছঃ) মের ৪৪ হাদিছ পড়িতে চাহেন তবে এইটী লউন।

মৌলুদ খয়রল বশার। মূল্য—৵০

মৌলুদ গোলসনে আরব। মূল্য—／০

হজরতের মোস্তাফা'র তাওল্লাদের কথা ও সুন্দর সুন্দর গজল

সহীদের মোরতজা মূল্য—／০

হজরত আলি অর্থাৎ খোদার সের কি প্রকারে মৃত্যু হইয়াছেন তাহা জানিতে চাহেন ত এইটি লউন

মারফত নামা। মূল্য—／০

মারফতি ভেদ কথা জানিতে বাসনা রাখেন ত বইটি পাড়ুন।

ছহিজঙ্গে রছুল। মূল্য— •

পবিত্র মক্কা সরিফের যুদ্ধ-ঘটনা জানিতে বাসনা রাখেন ত এইটী গ্রহণ করুন

শিরি ফরহাদ। মূল্য— •

সত্য প্রেমের ঘটনার মধ্যে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ছাহি সখি সোনার কেচ্ছা। মূল্য—৶১০

অতি আশ্চর্য্য নূতন কেচ্ছা পড়েন ত সখিসোনা লউন

ছাহ শাশুড়ী জামায়ের কেচ্ছা। মূল্য—/০

ঘরজামতার বিবরণ জানিতে চাহেন ত এইটি পড়ুন

ছহি সোলেমানি তালেনামা। মূল্য—৶১০

পয়গম্বর ছোলেমান আলায়হেচ্ছালামের হুকুম মত নানাবিধ তাবিজ।

ছহি বড় ছায়েত নামা। মূল্য—৶০

রাশি লগ্ন গুনিতে, সময় অসময় যাত্রার ফলাফলের কথা

ছহি অজুদ নামা। মূল্য ৶০

অজুদের আঠার মোকামের কথা এহাতে খোলসা লেখা হইয়াছে।

আখবারল অজুদ। মূল্য—৶০

পীর মুরিদের ছওয়াল জবাব ও জেকের করিতে কোন মকাম হইতে কোন লতীফা জারি হইয়াছে তাহা এই কেতাবে খোলাছা লেখা আছে

ছহি লক্ষ্মী শনির ঝগড়া। মূল্য—৶০

জানে আলম বাদসার দুঃখ ও সুখের কথা এই গ্রন্থে।